# নয়ন ঝুমুরী ও রসিক নাগর

রবীন রায়চৌধুরী

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ
অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৫৮

প্রকাশক
সমীর কুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা-২৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
গৌতম রায়

মুদ্রাকর
সুনীলকুমার ভাণ্ডারী
জগদ্ধাত্রী প্রিণ্টার্স
৫৯/২, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

যে আমাকে ভালবাসতে শিখিয়েছিল, ভালবাসার মধ্যেই যার সব পরিচয়,—সেই নয়ন, আমার ভালবাসা, তারই স্মৃতির প্রতি—

# লয়ন ঝুমুরী ও রসিক লাগর—রবীন রায়চৌধুরী

রসিকের আর কোথাও মন বসে না। খুয়াল হরিণের মতো তার মন ছটফটিয়ে ছোটে, আজ এই ঠাঁই কাল ঐ ঠাঁই।

সেটা পৌষ মাস। কেন্দুলে মস্ত মেলা বসেছে। রাজ্যের বৈরাগী, সংসারীর ভিড়। আউল, বাউল থেকে শুরু করে ফকির, দরবেশ, নেড়ানেড়ি সবাই গিয়ে জমেছে। নানান্ রঙ ফকিরের সঙের কারবার চলছে। আখড়ায় আখড়ায় অন্নভোগ, গৃহীদের অন্নছত্র শুরু হয়েছে। অদূরে কাঙাল ক্ষ্যাপার আশ্রমে, বেদনাশা বটতলায়, পঞ্চমুণ্ডীথানে, মহাশ্মশানে জুটেছে বিচিত্র ভাবের মানুষ। কেউ একতারা, কেউ খঞ্জনি, কেউ মন্দিরা বাজিয়ে গুণ গুণ করে গান ধরেছে। বাউল বাবাজীরা নেচে নেচে গুপীযন্ত্র তোলপাড করে মেলা জমিয়ে তুলেছে। আর তার মাঝেই চলেছে সুখ সোহাগের কারবার।

কুশেশ্বরনাথের পৈঠায় বসে রসিক ঐ সব শুনছিল, দেখছিল। অজয়ের বুকে অনেকখানি চরা পড়ে গেছে। ওপারের শালবনে উত্তুরে হাওয়া বয়ে চলেছে। এপারে মেলার মানুষজনের হৈ-হট্টগোল। চটুল গালগপ্পো, যাত্রা, কবি, বাউল, ম্যাজিক সব রকমের কারবার। তার মাঝে সাধু ফকিরদের পাগলামি, নেড়া-নেড়িদের কেচ্ছা, ব্যাপারীদের ফন্দি-ফিকির। জয়দেবের মন্দির, অজয়ের পাড, কেন্দুবিল্ব গ্রাম জুড়ে চলে ভাবের, ভবের নানান্ সওদার কেনাবেচা।

সেই একঘেয়ে পুরানো দৃশ্য। ভোগের আয়োজন, ভোগ্যদ্রব্য নিয়ে কাঁড়াকাড়ি। রসিকের মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। এই ঠাকুর সেবাইতের ঠাঁয়েও সুখ নেই, শান্তি নেই। কোথায় থেকে রাজ্যের সব জঞ্জাল এসে জোটে। কেঁদুলের মেলার ভিড়ে রসিক সুখ পায় না। ভেতরে ভেতরে সে অস্থির হয়ে পড়ে।

মেলা ভাঙতে সেও জয়দেব ঠাকুরের পূজিত বিগ্রহ রাধামাধব মন্দিরে গড় হয়ে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়ে। যে পথটা সোজা পুবমুখো হয়ে ইলাম-বাজারের দিকে গেছে, রসিক সে-পথ ধরে হাঁটতে থাকে। কোথায় যাবে ঠিক নেই। আপন খেয়ালে আজ এখানে কাল সেখানে ভেসে বেড়ায়।

পাকা সড়কে উঠে এক বাবাজীর সঙ্গে দেখা। হাতে একতারা, পরনে আলখাল্লা, কাঁধে ফকিরের ঝোলা। পথ চলেছে, গুণ গুণ সুর, টুং টুং তারের শব্দ। একই পথে আগেপিছে দুজনে চলেছে। রসিক এক সময় বাবাজীর সাথ ধরল। বাবাজী মাথা ঝুঁকিয়ে হাসল। রসিকও হেসে প্রত্যুত্তর দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে চলল।

বাবাজী গুণ গুণ সুরে গান ধরেছে :

ওরে মন ভোলালি, ঘর ছাড়ালি, পথ হারালি কিসের বশে,
মনের মধ্যি ডুব দিলে তোর মিলবে ওরে পথের দিশে।
চোরের ভয়ে মণিমুক্তো লুকিয়ে বেড়াস যতন করে,
মনচোরা যে, তারে তো মন চিনলি না রে॥

চোখে চোখে হাসি ফুটিয়ে বাবাজী আপন মনে গান গাইতে গাইতে পথ চলেছে আর রসিকের মনে শুরু হয়েছে কিসের তোলপাড়। 'মনের মধ্যি ডুব দিলে তোর মিলবে ওরে পথের দিশে'—রসিকের ভাবনা শুরু হয় কিন্তু কুল পায় না। বাড়ি থেকে যেদিন পালিয়ে আসে সেদিন কি পথ খোঁজার তাড়া ছিল?

বাপের সঙ্গে কাজিয়া করে ঘর ছেড়েছিল। প্রথম প্রথম চিন্তা হত খাওয়া থাকার। পরে কবে থেকে সে চিন্তাটাও চলে গেছে। এখন ও-সব নিয়ে আর ভাবনা হয় না, কোথাও না কোথাও দু'মুঠো জুটে যায়। কিন্তু দিনে দিনে বুকের মধ্যে অন্য এক জ্বালা শুরু হয়েছে। কোথাও আর মন টেঁকে না, দু-চারদিন যায়, তারপরেই পালাই পালাই। বুঝতে পারে না, কোথায় যাবার এ তাড়া। আজ ঐ গান শুনতে শুনতে ওর চমক লাগল। এ তো বাপু বুঝার কথা—'মন চোরা যে, তারে তো মন চিনলি না রে।'

বাবাজীর গান কখন থেমে গেছে, শুধু একতারাটা মিষ্টি আওয়াজ তুলে বাজছে। বীরভূমের লাল কাঁকর, বালি, ধূলোর মধ্যে মিশে গিয়ে বাবাজীর গেরুয়া আলখাল্লাটা কেমন উড়ছে। বাবাজীর চুলে, দাড়িতে লাল লাল ধূলো, বাবাজীর চোখে-মুখে এক অসীম আনন্দ ফুটে উঠেছে।

বাবাজী রসিককে অমন আপনভোলা হয়ে চলতে দেখে একটু হেসে বলল, কি বাবাজী, মুনের মধ্যি একেবারে সেঁধিয়ে গেছ, লাগছে?

চমকে রসিক ঘাড় ফেরায়। বাবাজীকে হাসতে দেখে বলে, বাবাজী, মুনের কথা বুললে, মুনের খিয়ালের তো কুনো থৈ পাই না। ঘর ছ্যাড়েছি গোঁয়ের্ বশে, বাপের 'পরে আগ করে, কিন্তু ইখুন আর উ-সব মুনে লয় না। মুনের ই কিসের জ্বালুনি, বুলতি পারো?

বাবাজী একটু শব্দ করে হাসল, টুং টুং করে একতারা বাজল, বাবাজী ছড়া কাটল—

ই কেমন দ্বন্দ্ব, ওরে অন্ধ, বন্ধ হলি আপুন ঘরে,
ঘরের লেগে হন্নি হয়ে ধন্না দিস তুই পরের দোরে।

বাবাজী গান থামিয়ে হাসল। টুং টুং করে একতারার আওয়াজ তুলে বলল, বাবাজী, তুমি মজেছ। আমার এত্‌টান বয়স হল তা উই মুনে জ্বালুনি তো ধরল না। গান গাই, তার বাজাই, কিন্তু সি গান তো বুকে বাজল না, বুকের ছড়ে তো সুর ফুটল না, আর তুমি কেমুন জমির জো-এর মতুন মুন তোয়্যার করেছ, গান শুনা মাত্তর মুনের তলে ডুব দিয়েছ। হ, ইয়ারে কয় দিশে লাগা, ইয়ার জন্তি যত টানা পোড়েন, যত বুক জ্বালুনি। ঘরে থাকা দায়, হাজার বান্ধ, সিই উড়ু উড়ু ভাবখানা জিইয়ে থাকে, সুযোগ পাওয়া মাত্তর ফুড়ুৎ! বাবাজী, তুমি তো ভাগ্যবান, কুন পুরুষে কি পুণ্যি করছেলে, ই কালে আর ঘর করতি হল নি। ই বয়সেই বাম্‌টান!

তারপর একতারায় একটু সুর তুলে ছড়া কেটে বলল—

সংসারে ভাই সার বিনে—সং সাজাই হল সার,
সারের মধ্যি সং সাজে যে,—ধন্য তারই ই সংসার।

বাবাজী, জলের মাঝে যেমুন চোরাসোত থাকে, প্যাঁচাইয়ের মধ্যি চোরাগর্ত, তেমুনি মুনের মধ্যি হাজার চোরাগুপ্তি, চোরাসোত। এর ল্যাগে বাবাজী, দিশারী দরকার, যারা মুনের অলিগলি বুঝে ভালো। তেমুন দিশারী মিলল তো বৈতরণী পার, লয়তো দহের ধার।

যত শুনছিল রসিক ততই অবাক হচ্ছিল। একে একে তার মনের চমক ভাঙছিল। বুকের মধ্যে কিসের জন্যে একটা খুশি ফুটে উঠছিল।

রাস্তার মোড়ে এসে বাবাজী থামল, এবার ভিন্ন পথ ধরবে। রসিকের বড় ইচ্ছে, বাবাজীর সঙ্গে যায়। বাবাজীর সঙ্গ ছাড়তে তার কষ্ট হচ্ছিল।

ওর কথা শুনে বাবাজীর মুখে হাসি ফোটে—

ওরে বৃথাই খুঁজিস সঙ্গী সাথী
একলা এলি একলা গেলি
একলা ভবে দিন কাটালি,
তবু তো তুই চিনলি না রে,
মন যে তোর পরাণ সাথী।

গান থামিয়ে বলল, বাবাজী, এই ভালো-লাগা ভালো-ভাবা কিছুই লয়। ক'দিন থাকতি থাকতি আবার সিই পুরানো জ্বালা, ভালো লাগবে না কিছু। এ্যর চে' তুমি লাভপুরে লেমে আউগাঁয়ে সাধন মাঝির ঠাঁয়ে যাও, অনেক শান্তি পাবে। এই যে ই সব গান শুনলে, ই সব উই সাধন মাঝির গাওনা। মানুষটো যে কী বুঝা বড ভার। আলকাপের দল করি বেড়ায়, খেউড খিস্তি দিয়ে আলকাপের কেপে, রঙ, ছড়া বাঁধে। সুময়-বিরেতে ধরি পডলে তখুন উ সব গান বাঁধে। বাবাজী যদি টিঁকতে পারো, গুজরের কড়ি মিলতিও পারে। কাছিমের কামুড় দিতি হবে, মাটি কামড়ি আখের জুটাতি হবে। আচ্ছা বাবাজী চলি, আবার কুথাও দেখা হইঙ্ যাবে।

বাবাজী গুণ গুণ করতে করতে পথ ধরল,

পথে পথে ছড়িয়ে আছে সত্যিকারের পথিক পাগল
চিনতে হলি দেখিস্ যেন চিনা-শুনায় হয় না গোল।

যতক্ষণ দেখা যায় রসিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ অদ্ভুত পাগলকে দেখতে থাকে। ওর পায়ের তালে তালে লাল লাল রাঢ়ের ধূলো উড়ছে। সেই ধূলোর মধ্যে লোকটা আস্তে আস্তে হারিয়ে যায়।

সেদিন লাভপুর স্টেশন থেকে ছয় সাত ক্রোশ হেঁটে রসিক হাঁপিয়ে পড়েছিল। অবশ্য সাধন মাঝির ঘর খুঁজতে ওর অসুবিধে হয়নি। ঐ তল্লাটে সকলেই চেনে, জিজ্ঞেস করে করে ও চলে এলো।

তখন সন্ধ্যে হয় হয়। রসিক দাওয়ায় বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল।

আশে পাশে গাছ-গাছালির মধ্যে দীপ্ দীপ্ জোনাকি জ্বলছে। পূর্ণিমা হতে আর ক'দিন যেন বাকী। চারদিকটা তাই ঘোর ঘোর লাগছে। বাড়ির পৈঠার গা ঘেঁষে একটা মস্ত শিশুগাছ। কোন্ গাছের কোটরে খুঁটে খুঁটে একটা কাঠঠোকরা পোকা বার করছে। তার অবিশ্রাম খট্ খট্ শব্দটা রসিকের বুকের মধ্যেও একটা প্রতিধ্বনি তুলছিল। একটা আশঙ্কা যেন মাথা চাড়া দিচ্ছিল।

ও সাধন মাঝির খোঁজ করাতে পথচারী কৌতূহলে তাকিয়েছিল, হ কুন্ গাঁয়ে গান হবে, কত্তা?

রসিক মাথা নেড়ে বলেছিল, না না, বায়না লিয়ে আসি নাই, উয়ার ঠেঁয়ে গান শিখব বুলে যেছি।

প্রশ্নকর্তা ঠোঁট কেটে হেসেছিল, অ, গান শিখবে, তা বাপু বেশ, ভালো গুরু ঠাওরেছ।

কেউ আবার চোখ মট্‌কে বলে, দেখো কত্তা, গান শিখা ভালো, কিন্তু কুনো আকাম যেন করি ফেল না।

রসিক অবাক হয়ে তাকায়, ই কেমুন ধাবা কথা, সাধন মাঝিরে গুরু করব, গান শিখব, আকাম কিসের লেগে?

লোকটা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, আরে না না, সি রকম কুনো কথা না, ঐ সাধন মাঝির খামখিয়ালের কথাটাই বলনু। কতজনাই তো গান শিখতে এলো গেল, তা দু'দিন যেতি না যেতিই মাঝি উয়াদের দূর দূর করি খেদিয়ে দেয়। আমরা ভাই বাইরকার লোক, অত সব ভির্ত্তরের খপর জানব কি করে, লোক মুখে শুনি তাই বলনু।

কেউ আবার ঠেস্ দিয়ে বলে, গুরু যদি করতি হয় সাধন মাঝিরেই ভালো, যেমুন গাওনা তেমুন বাজনা, তা কত্তা থাকবে কুথায়, মাঝির দাওয়ায় তো? হুঁ, উ দাওয়ার হাওয়া ভাল্ লয়, বাতাস লাগতি পারে, দেখ বাপু, বুঝে সুঝে চ'ল, তেমুন মুন হলে পূবপাড়ায় আমার খোঁজ লিও, কিছু একটা করা যাবে, রফাও চলতি পারে।

পথে আসতে আসতে এই সব কথাবার্তা রসিককে চিন্তিত করেছিল। কেমন যেন ঘোরালো কথাবার্তা, বুঝা ভার। তবে কি মাঝি গান শিখাবে না? তখনই আবার বোরেগী বাবাজীর কথা কানে বাজে—হুঁ বাবাজী, কাছিমের কামুড় দিতি হবে। মাটি কামড়ি আখের জুটাতে হবে।

সাধন মাঝির দাওয়ায় বসে এই সব নানান্ কথা মনে পড়ছিল। এমন সময় দেখল, প্রদীপ হাতে গুণগুণ করতে করতে একটা বউ সন্ধ্যে দিতে বাইরে এলো। দরজায় দরজায় প্রদীপ দেখিয়ে ফিরে যেতে গিয়ে হঠাৎ দাওয়ায় নজর পড়ল। রসিককে দেখে একটু ঘোমটা টেনে কোথায় থেকে এসেছে, কাকে খুঁজছে ইত্যাদি জিজ্ঞেস করল।

তার কথা বলার ফাঁকে প্রদীপের নড়াচড়া আলোয় রসিক তার দিকে তাকিয়ে অবাক! এ কে? তবে যে শুনেছিল সাধন মাঝির বয়স ষাট পেরিয়েছে? এ কি সাধন মাঝির মেয়ে? এমন ডাগর ডাগর বয়স, চটুল চটুল চলন বলন?

তাকে অমন ভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে বউটির চোখে কৌতুক ফুটেছিল, একটু যেন রাগের ভঙ্গীতে বলেছিল, আপুনি কেমুন ধারা মানুষ, সাঁঝবেলায় পরের দাওয়ায় বসে পরের বউয়ের দিকে তাকায়ে থাকেন?

তার কথায় লজ্জা পেয়েছিল রসিক। লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি তার উদ্দেশ্য জানিয়েছিল। ওর বড় সাধ, সাধন মাঝির কাছে গান শেখে। সাধন মাঝির সঙ্গে দেখা করতেই সে অনেক দূর থেকে আসছে।

ওর উদ্দেশ্যর কথা শুনে মেয়েটি একটু শব্দ করেই হেসে উঠল, ও হরি, গান শিখতি হবে! গান শিখ্যা হবেটা কি? ঘরেতে কি সোহাগী বউ নাই, ছ্যাড়ে দিলে যে বড? গান তারই হয় যার বুকে দুখের জুয়ার বয়। আপুনার কিসের দুঃখু গো, অমুন জুয়ান বয়স, বুকের পাটা! ঘরে ফির‍্যা যান, বউ ছ্যালে লিয়ে ঘর করেন। মাঝি কাউকে গান শিখায় না।

প্রথম কথাগুলো যত না বুকে বেজেছিল পরের কথাটায় হতাশ হল ভীষণ। রসিক খুব উদ্বেগ নিয়ে বলল, আমি যে অনেক আশা লিয়ে এইছিনু ঠাকরোণ। ঘর সংসারের কথা জিজ্ঞাসলেন, উ সব পাট হয় নাই, উ সবের তাড়াও নাই। সিই কবে থেক্যা ঘুরে বেড়াচ্ছি একটু শান্তির ল্যাগে, কিন্তু কুথাও তেমুন ঠাঁই মিলছে না। অনেক কথা শুন্যাই মাঝির কাছে আনু, তা উনি না শিখালে আর কুথাও যেতি হবে।

বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে প্রদীপটা বুকের কাছে নিয়ে তেমনি ভাবে হাসতে হাসতে মেয়েটি বলল, তাই বুলেন, বউয়ের সাধ মেটে নাই। তা এঁটো কুইড়ে চলবে কদ্দিন? উ শরীলে গান হবে না, উই হাতে পাস্না, শাবল চলবে ভালো, বুঝলেন?

মেয়েটি ফুলে ফুলে হাসতে লাগল। তার হাসির শব্দের সঙ্গে রসিকের নাকে বাতাবি লেবুর গন্ধ এসে লাগল। বাতাবি লেবুর গাছে ফুল ফুটছে, গন্ধ ছুটছে। কোন্ গাছ থেকে লুকিয়ে একটা পাখি ডেকে উঠল, ওকিও, ওকিও। রসিক সেই হাসিতে টালমাটাল মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলে, তা ঠাকরোণ, আপুনি যদি একটু বুলে কয়ে দেন। হাজার হোক আপুনার পিতৃ তো বটে?

এবার আর মেয়েটির হাসি থামতে চায় না। ফুলে ফুলে হাসতে হাসতে বলে, আ পুড়া কপাল, অমুন অন্ধ মানুষ লিয়ে কুনো কাজ হবে না, হাতে শাঁখা সিঁদুর চোখে পড়ে নাই না কি, না চোখে লিশে লাগছে? আমি যে মাঝির বিহ্যা করা বউ গো, তিতিয় পক্ষ! অনেক খুঁজি পেতি বাপকে এক কাঁড়ি টাকা

দিয়্যে ঘরে এনেছে। আর আপুনি কি না অমুন গালটা পেড়ে দিলেন! আপুনার গান শিখ্যা হবে না, অন্ত কুথা যান, যিখানে সোমত্ত ম্যাইয়া জুটবে।

রসিক ভীষণ লজ্জায় কুঁকড়ে গেছে। না জেনে অমন কথাটি বলে ফেলেছে। গান শেখা হবে না শুনেও ওর আর দুঃখ হল না। ওর সব চেতনা জুড়ে তখন ঐ লজ্জার জন্ম পরিতাপ হচ্ছিল। মাঝি-বউয়ের কাছে অন্যায় স্বীকার করার জন্যে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল, মাঝি-বউ কখন চলে গেছে।

রসিক ভেতরে ভেতরে হতাশ হয়ে পড়ল। কোন্ কথা থেকে কোন্ কথা! ওর বোঝা উচিত ছিল, মাঝির বউ আছে, ও বউও হতে পারে। আর বৌ কি মেয়ে তাতেই বা কি গেল এলো, অত খোঁজই বা কিসের? এখন ঠেলা সামলাও।

যে উৎসাহ নিয়ে পথে নেমেছিল, বৈরাগীর কথায় যে ভাবে মেতে উঠেছিল, সব যেন আস্তে আস্তে মিইয়ে আসতে লাগল। সেই গাছ-গাছালির আওতায়, লেবু পাতা ফুলের গন্ধ, পাখিদের টুকুস্ টুক টুক ডাক, সাঁঝবেলায় জোনাকির দীপ্ দীপ্ জ্বলা-নেভার মধ্যে রসিক কেমন বিমনা হয়ে পড়ছিল, ওর এত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে? রসিক দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে সম্মুখের ঝোপ ঝোপ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল।

কিছুক্ষণ পরে খুট্ করে শব্দ হল। ঘরের দরজাটা খুলে এক ঝলক আলো দাওয়ায় এসে পড়ল। দরজার গায়ে মাঝি-বউ এসে দাঁড়িয়েছে, হাতে লণ্ঠন।

আসেন, ঘরে আসেন, রেতটুকুন তো থাকেন, তাপর মাঝি এলে যা ভালো হয় উই বুলবে, তখন না হয় আর কুথাও সোমত্ত ম্যাইযার খোঁজে যাবেন।

সাধন মাঝি নাই না কি? রসিক অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

আহা—গ্যাকা! মাঝি থাকবে তো তার তিতিয় পক্ষের ডাগর বউটি কথা কইবে কেনে? উয়ার লাজ সরম নাই না কি?

রসিক ঘরে ঢুকে দেখে মেঝেয় একটা চাটাই পাতা। একটা ফুল তোলা বালিশ। ঘরের মাঝে পাশের ঘরের দরজা।

ঘরের নিকানো দেয়ালে সাদা খড়িতে নক্শা আঁকা। দরজার দু'পাশে দেয়ালে গেরি মাটি দিয়ে গোল গোল আলপনা করা। ঘরের মাঝ-দেয়ালে একটা মা ছেলের রঙিন ক্যালেণ্ডার হাওয়ায় দুলছে। এক কোণে ক'টা টিনের তোরঙ্গ, শাড়ির পাড় সেলাই করে তাদের ঢাকা তৈরি হয়েছে। পাড়ের রঙগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রসিক মুগ্ধ হল, না, মাঝি-বউয়ের নজর আছে; কেমন সাদাসিধে অথচ কি রকম সব গোছান-গাছান।

রসিক ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে এই .সব ভাবছিল, হঠাৎ মাঝি-বউয়ের কথায় ওর হুঁশ হল, অমন ঠায় দাঁইড়ে কার কথা ভাবছেন গো, তেমুন কেহু আছে নাকি?

রসিক ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে. উঁহু, সি সব লয়, এমুন ঘরে দাঁইড়ে বড় আপুন ঘরের কথা মনে পইড়ে যায়। কেমুন গোছান গোছান, ফুল তোলা বাক্স প্যাটরা, পাটি চাটাই, ত্থালে লক্ষীর পাউটি, খড়িমাটির এলুনি, বিশেস করেন, মুন কেমুন ভরি ওঠে।

হু, উ সব এখুন রাখেন, উ সব বুলার অনেক সুময় পাবেন, এখুন হাত মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসেন, কুন্ কালে বেইরেছেন তা খিয়াল আছে?

মাঝি-বউয়ের গলার স্বরটা কেমন কাঁপছিল। রসিক বউয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে অবাক হল, এ কে, এ তো সেই চটুল ঠোঁট-কাটা মেয়ে নয়! কেমন এক গভীর প্রীতিতে মাঝি-বউয়ের চোখ মুখ ভরে উঠেছে। একটা তৃপ্তি নিয়ে রসিক উঠানে নেমে গেল।

রসিক হাত-মুখ ধুয়ে এসে ভিতরের পিঁড়িতে বসল। এক বাটি মুড়ি ছাতু ঝোলা গুড় নিয়ে এসে মাঝি-বউ খেতে দিল।

একটু দূরে বসে বলতে লাগল, আমি তো মাঝি-বউ, আমাকে মতিঠাকৃরোণ বলেই ডাকবেন। আমি কিন্তু উই আপুনি করতি পারব না। হাজার হোক কত ছোট! এতটি বয়স হল, কপালে বউয়ের সুহাগ জুটে নাই। তা শরীলটা যে অমুন ডাকাবুকো করলে, বুকে জ্বালুনি ধরে না, কেমুন পুরুষ গা তুমি?

রসিক আর ভালো করে মাঝি-বউয়ের দিকে তাকাতে পারে না। কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করে। আর ঐ যে একটা শ্রদ্ধার সম্বন্ধ, তাতে আরো বাধো বাধো ঠেকে। ও মাথা নিচু করে খেয়ে উঠে পড়ে।

ঘরে চাটাইয়ে শুয়ে সে ঐ সব কথা ভাবছিল। যদি সাধন মাঝি গান শেখাতে না চায়?

একটা আশঙ্কায় রসিকের বুকটা কেঁপে ওঠে। বড় আশা নিয়ে এসেছে। কত মেলাই তো ঘুরল, কাঁপান, কবি, বোলান কত গানই তো শুনল, যত দেখে ওর বুকের মধ্যে একটা ইচ্ছে মাথা কুটতে থাকে, অথচ বুঝতে পারে না, কী চায়! বাবাজীর সাথে দেখা না হলে হয়তো তেমনি ভাবেই পথে পথে ঘুরে মরতে হত। হাজার রকম মানুষের সঙ্গে তো মিশল কিন্তু বাবাজীর মতো মানুষ দেখল না। ওরা কোটিতে গুটি, ওরা রংচোরা, চেনা ভার। কথায় বলে বাবাজী

পথ দেখিয়েছিল। বাবাজীর কথাগুলো এখনও কানে বাজছে···মুনের মধ্যে হাজারো চোরাগুপ্তি, চোরা সোত। এর ল্যাগে দিশারী দরকার, যারা মুনের অলিগলি বুঝে ভালো। তেমুন দিশারী মিলল তো বৈতরণী পার, লয়তো দহের ধার।

রসিক ভাবতে ভাবতে নিজের চিন্তায় হারিয়ে যায়।

এমন সময় মতিঠাকরুণ এক ঘটি জল নিয়ে ঘরে ঢুকল। নিচু হয়ে জল রাখতে গিয়ে ওর বুকের আঁচলটা রসিকের শরীরে খসে পড়ল। রসিক থতমত খেয়ে উঠে বসল।

আঁচলটা বুকে তুলতে তুলতে মতিঠাকরুণ বলল, আঁচলার হাওয়াতেই অমুন, হ পুরুষ বটে তুমি। তুমি আবার কত্তাবাড়ির সোমত্ত ম্যাইয়ার খোঁজ লিচ্ছিলে? তারপর একটু হেসে বলল, জল রইল লণ্ঠনও রইল। রেতে ভয় লাগলে উই দুয়ারে গিয়ে ডাক দিও। ঠেসান রইল, কিন্তু দেখো, ডাক না দিয়ে খুলো না যেন। হাজার হোক একটা ডাগর ম্যাইয়া তো বটে। ঘুমের ঘোরে কেমুন থাকে না থাকে আর তুমার বয়সটা তো ভালো লয়, তারপর বউয়ের সুখ এখুনও জুটে নাই, শ্বাসে কি থেকি কি হয়! তুমি বাপু ডাক দিও, কেমুন?

মতিঠাকরুণ কেমন এক দুর্বোধ্য হাসি হেসে লণ্ঠনটা কমিয়ে দিয়ে তার ভারি বুক, সরু কোমর, গুরু নিতম্ব চঞ্চল করে পাশের ঘরে চলে গেল। একহারা কাপড়ের আড়ালে ওর আদুড় শরীরটা আর আগঢাক মানছিল না। ও আস্তে আস্তে দরজটা ভেজিয়ে দিল।

একলা ঘরে অচেনা পরিবেশে শীতের রাত্রে রসিকের কেমন যেন ঘুম আসছিল না। মতিঠাকরুণকে প্রথম থেকেই ওর কেমন হেঁয়ালির মতো মনে হচ্ছিল। প্রতিটি কাজে প্রতিটি কথায় মতিঠাকরুণ কেমন যেন দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে। অথচ কী রূপ, হাজারে অমন রূপ হয়। প্রতিমার মতো রূপ, কাঁচা সোনার মতন রঙ, তেল চিক চিক পিচ্ছিল শরীর, চলনে বলনে ভরা গাঙের ঢেউ, চোখে মুখে আতসবাজীর ফুলকি। ঐ শরীর দেখলে রক্তে আগুন জ্বলে। বুকের কাছে ঐ শরীর দেখলে ভয় হয়, একটা জ্বালা বুকের মধ্যে আকুপাকু করে। আরশুলা যেমন কাঁচপোকাকে বিমোহিত করে, ঐ শরীরটায় ঐ রকম টান। ওর পিছে পিছে পাগল হয়ে ছোটে সুখ।

মতিঠাকরুণের সঙ্গে একটা শ্রদ্ধার সম্পর্ক খুঁজে রসিক কিছুটা স্বস্তি পায়। মতিঠাকরুণের চিন্তার মধ্যেই ও ঘুমিয়ে পড়ে।

মতিঠাকরুণের চোখে ঘুম নেই। কী এক ভীষণ অস্থিরতায় ও ছটফট করছিল। নিত্য দিনের মতো এক নিদারুণ কাতরতা তাকে পেয়ে বসছিল। একটা অসহ্য যন্ত্রনায় শরীরটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছিল। বালিশে বুক চেপে কিছুক্ষণ নিশ্চল ভাবে পড়ে থেকে ও এক সময় উঠে পড়ে।

ঘরে লণ্ঠনটা টিম টিম করে জ্বলছে। বদ্ধ ঘরে স্বল্প আলোয় সারা দেয়াল জুড়ে আলম্ব সব প্রতিচ্ছবি। কেমন ভূতুড়ে মনে হচ্ছে চারপাশ। মতিঠাকরুণ কি ভেবে কুলুঙ্গীর দিকে এগিয়ে যায়। ভারী শরীরটা থেকে অগোছালো কাপড় মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে।

গলা থেকে একে একে মাদুলির মালাগুলো ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে কুলুঙ্গী থেকে সৌখিন আয়নাটা নিয়ে আলোটা উস্‌কে দেয়। দপ্ দপ্ করে লণ্ঠনটা জ্বলে ওঠে। সেই আলোয় মতিঠাকরুণের চেহারা স্পষ্ট হয়। আয়নাটার দিকে মুখ ফিরিয়ে ঠায় তাকিয়ে থাকে। ঠোট কেটে হাসে। ঠোটে গালে টুস্‌কি দিয়ে চোখ কুঁকড়ে হাসে। এক সময় বুকের আচল ফেলে দিয়ে মতিঠাকরুণ নিজের উদোম শরীরে তলিয়ে যায়।

দেখতে দেখতে তার শরীরে কেমন কাঁপন জাগে, ওব আর সহ্য হয় না, আয়না ফেলে দিয়ে বিছানায় মুখ গুঁজে আছড়ে পড়ে। ভীষণ এক উত্তেজনায় শরীর ফুলে ফুলে উঠছে। বুক চিরে ভারী নিশ্বাস পড়ছে। মতিঠাকরুণ নিজের শরীর আঁকড়ে শান্তি পেতে চায়।

শেষে এক সময় সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। তারপর আপন মনে বিড বিড করে বলতে থাকে, হ, ধম্ম লিয়ে থাক্, ধম্ম কম্মে মুন দে, উয়াতে সগ্‌গ লাভ হবে। তা তো বুলবেই, ঘেটে বুড়ো উ ছাড়া আর কি বুলবে, দু' মাগীতে শরীল জুড়িয়ে এখুন ধম্ম কম্ম! তা সত্তুরে মাগী বিয়া করলে না কেনে, উ-ও ধম্ম ধম্ম করত। জুয়ান ম্যাইয়া বিয়া করার সুময় খিয়াল হয় নাই, উয়ার একটা শরীল আছে। শরীলের খিদে তিষ্টে আছে, ধম্ম কম্ম করলি উয়'র শরীল জুড়ায় না, জ্বালুনি থামে না।

চলি যাব, যিখানে মুন চায় চলি যাব, থাক তুমি তুমার ধম্ম লিয়ে. পচে পচে মর, মুখে এক গিলাস জল দিতে আসব না, মরলে, কি রইলে খোঁজ লিতে আমার বয়ে গেছে। হুঁ, আবার হাত ধরে আদর কাড়া, বউ, তু ছাড়া আমার আর কেহ নাই, তু আগ করলে আমার বুক ফাটে, মুন কাঁদে। এ তো লিয়তি, লয়তো তুরই বা আমার সাথে বিয়া হবে কেনে? ধম্ম কম্মে মুন দে, শান্তি পাবি।

এ সব কথা মনে পড়তে মতিঠাকরুণের গা জ্বলে ওঠে, মুনে খেদ থাকবে না, হ, তুমার ঠাকুর সব খেদ মিটায়ে দিবে। ষেটে বুড়োর ভিমরতি ধরেছে, গতরের সঙ্গে চোখেও পচন ধরছে, হ ধম্ম কম্মে মুন দে।

হঠাৎ পাশের ঘরে কাশির শব্দে ঠাকরুণের চিন্তা কেটে যায়। রসিকের কথা মনে পড়ায় কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। রসিকের চাতালো শরীর, মস্ত ছাতি, নিরেট দাবনা, তার লাজুক লাজুক চোখ ইত্যাদি ভাবনার মধ্যে মতিঠাকরুণ কেমন তলিয়ে যায়, ওর আর কোন কষ্ট থাকে না।

হঠাৎ মাঝরাতে খুট করে আওয়াজে রসিকের ঘুম ভেঙে গেল। সেই আবছা লণ্ঠনের আলোয় দেখল, মতিঠাকরুণ দরজা খুলে বাইরে গেল। আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে, শরীরের প্রতি তেমন দৃষ্টি নেই। ফিরে এসে দরজা লাগাল। নিজের ঘরে ঢুকে খুট করে খিল তুলে দিল। রসিক এ ঘরে শুয়ে মতিঠাকরুণের জল খাওয়ার ঢক্ ঢক্ শব্দ শুনল।

পরের দিন শেষবেলা নাগাদ সাধন মাঝি ফিরল। দাওয়ায় রসিককে বসে থাকতে দেখে বিরক্তিতে ওর মুখ চোখ কুঁচকে উঠল। কিছু না বলে ঘরে ঢুকে গেল। খানিকটা পর মতিঠাকরুণের গলা শোনা যায়। সাধন মাঝির সঙ্গে কি নিয়ে কথা কাটাকাটি হচ্ছে। আরো খানিকটা পর মাঝি বাইরে এলো।

রোদে তেতে পুড়ে এসেছে। তেমন তাতালো গলায় বলল, তু গান শিখবি, তু গানের কি বুঝিস কি? শখ হইছে, শালা শখ হইছে তো লাগর হলি নে কেনে? অমুন বয়সে অনেক পীরিতের মুন ভজাতে পারবি। অমুন খাই খাই অঙ্গে গান হয় না, বুঝলি, গান শিখতি হলে অঙ্গে বাঁধুন দিতে হবে, পারবি? বয়সটা আরো তিরিশ বছর বাড়ায় লিতে পারবি? পারবি শীত গীম্মে ঘাড় গুঁজি পড়ি থাকতি? তু শালা, ঘাটে ঘাটে জল খেইছিস তো ঘটি ঘটি, হজম হলনি কেনে? হজমের জন্যি লিয়ম দরকার, বুঝলি, আনচান মুন লিয়ে ভজন সাধুন হয় না। যিদিন দেখব, শালা শখের কড়ি খুঁজছে, লাথ্যে দূরে করে দেব। উ সব ভড়ং ফড়ং ইখানে চলবে না।

বলতে বলতে মাঝি রোষে ফুলছিল, ওর অমন হাল্কা দেহটা শানিয়ে উঠেছিল, মাঝি চোখে জ্বালা ফুটিয়ে ওকে কুটছিল।

রসিকের কেমন অস্বস্তি লাগছিল। মাঝির কথাগুলো বুকে বাজলেও কিছু মুখ ফুটে বলতে পাবে নি। মাঝির সামনে নিজেকে কেমন অসহায় লাগছিল। চোখে চোখ রাখাই কঠিন, মুখ তুলে কথা বলা শক্ত, এমনই মাঝির দাপট। মন যখন অস্বস্তিতে ভারী হয়ে উঠছিল তখনই কানে বাজছিল বোরেগীব কথা। বসিক কিছু না বলে মুখ বুজে সব শুনে গেল।

সাধন মাঝির গায়ে একটা মার্কিনের ফতুয়া, গলায় দু'ফেত্তা চাদর, হাঁটুর ওপরে মালকোচা মারা কাপড। হাত পা মুখ গায়ে ধুলোব আস্তরণ। মাঝির এখনও হাত মুখ ধোয়ার সময় হয নি। মতিঠাকরুণের মুখে শুনেই বেরিয়ে এসেছে। রসিককে অমন হাবা হাবা হয়ে বসে থাকতে দেখেই মেজাজ চড়ে গিয়েছিল, তারপরই ঝাল ঝাডা। এমন উট্‌কো সখ মাঝির সহ্য হয় না। গান শিখবে, গান গেয়ে লায়েক হবে—এ সব মানুষ দেখলে গা পিত্তি জ্বলে যায। মাঝি দুব দুব কবে তাডিয়ে দেয়।

বসিককে অমন ভাবে চুপ করে দাঁডিযে থাকতে দেখে একটু অবাক হয়, মানুষ নাকি, মান অপমান বোধ নেই?

মাঝির অমন কাট কাট কথা শুনে প্রথমেই অনেকে পালায়। মাঝি অমন রগচটা, রুক্ষ, মুখে ভালো কথা নেই, দিনরাত যেন দুর দুর কবে বেড়াচ্ছে।

রসিক কোন উচ্চবাচ্য না করায মাঝি একটু ঠাণ্ডা হয, মুখ ঝাঁঝিয়ে বলে, তা অমুন সাধুটি সেজে দাঁইডে না থেকে, যা, ছিলিমটা সাজিযে লিয়ে আয়। লবাব পুত্তুরের মতুন গতর পুষবার ইখানে কেহ নাই, গতর খাটিয়ে খেতি হবে। পারিস থাক, লয়তো দুর হ।

মাঝি দুপ দাপ করে লম্বা লম্বা পা ফেলে কুয়োতলার দিকে এগিয়ে যায়।

মাঝি যেমন তেড়ে এসেছিল সেই রকম তেজে চলে গেল। প্রথম সাক্ষাতেই এমন, রসিক ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। মাঝি ছিলিম সাজতে বলল কিন্তু রসিকের কিছুই জানা নেই, কোথায় কল্কে, কোথায় তামাক, কি করবে বুঝে উঠতে পারে না। এমন সময় খুট খুট শব্দে মুখ ফেরাল, জানালায় মতিঠাকরুণ, মিট মিট করে হাসছে। মতিঠাকরুণের হাসি দেখে কেন যেন রসিকের দুশ্চিন্তা কেটে গেল, ওর বুকটা হাল্কা হল। ও মুখ ফুটে ছিলিমের কথা বলতে গিয়ে দেখল ঠাকরুণ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে থামতে বলছে। একটু বাদে তামাক সেজে ওর হাতে

দিয়ে গেল। মাঝি আসতে আসতে রসিক টিকেতে ফুঁ দিয়ে দিয়ে কল্কে তাতিয়ে নিল।

সেইদিন সন্ধ্যায় সাধন মাঝি রসিকের হাতে স্থাড়া বাঁধল। রসিক প্রণাম করার জন্যে উবু হতেই সাধন মাঝি হঠাৎ পিছিয়ে গেল। রসিক অবাক!

সাধন মাঝি মুখ খিঁচিয়ে বলল, শ্যালা, পার হবি আর পারানি দিবি না!' গুরু করলি তো দক্ষিণে দে, বার কর কি আছে তুর?

রসিক ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ পাশের ঘর থেকে চুড়ির আওয়াজ শুনল। রসিকের সকালের ঘটনাটা মনে পড়ল।

রসিকের সামনে একবাটি মুড়ি নাড়ু নামিয়ে দিয়ে মতিঠাকরুণ বলেছিল, তা গান তো শিখতি চাও, মাঝি না হয় তুমার গুরু হল কিন্তু গুরু মানলিই তো দক্ষিণে দিতে লাগবে। তা দক্ষিণে কিছু সাথে এনেছ তো?

রসিক ভীষণ দ্বিধায় পড়েছিল, তাই তো, এ কথা তো সে ভাবে নি।

ওকে অমন দুশ্চিন্তা করতে দেখে মতিঠাকরুণ ম্লান হেসে বলেছিল, শুন, সোনাদানায় ইয়ার দক্ষিণে মেটে না, আরো কিছু দরকার। যখুন মাঝি দক্ষিণের কথা বুলবে, তুমি বুল, ই জীবনটো দক্ষিণে দিলেম। মাঝি হয়তো তুমায় গান শিখাতে পারে। কতজনাই তো স্থাডা বাঁধল, অনেক সোনাদানা লিয়ে পেরনাম করলে, মাঝি উয়াদের দুর দুর করে তাড়ায়ে দিল, বুলল, যা, তুদের দ্বারা গান হবে না। এ কি ভুট্টোদানা যে সোনায় বিকোবে? দেখো, ইবার যদি তুমার দক্ষিণেয় উয়ার মুন ভরে।

পাশের ঘর থেকে চুড়ির শব্দে রসিকের সব কথা মনে পড়ল। ও আর কোন দ্বিধা না রেখে বলল, আমার তো সোনাদানা কিছুই নাই, ই জীবনটো আছে, কত্তা, ইটাই তোমায় দিলাম। আমাও শিখাও, তুমায় গুরু বুলে মানছি।

তার কথা শুনে সাধন মাঝির চোখ দুটো ঝক্ ঝক্ করে জলে উঠল, বলল, শ্যালা, কি হলপ্ করলি মুনে থাকবে? আজ থেকি তুর শরীলটা আমার হল। তুর শরীলের উপর তুর আর কুনো দাবী রইল না, আমার ইচ্ছেয় তুর শরীল চলবে, খিয়াল রাখিস? শ্যালা বেইমানি করিস্ তো গুরুর শাঁপা লাগবে, তুর গলা দি গানের বদলে অক্ত ঝরবে।

সেদিন থেকেই রসিকের শিক্ষা শুরু। সাধন মাঝি কখনো হারমোনিয়ম বাজিয়ে, কখনো তবলায় চাঁটা মেরে আলকাপের রকম সকম বোঝাচ্ছিল। গাঁ থেকে দল আনিয়ে আলকাপের রীতিনীতি দেখাচ্ছিল। মাস্টার, ছড়িদার,

ছোকরা, বাজিয়ে—কার কি কাজ, কখন কি ভাবে ছড়া কাটতে হয়—একে একে সব দেখিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

তালিম শেষে যখন দাওয়ায় বসে সাধন মাঝি হুঁকো টানছে তখন রসিক পায়ে পায়ে ওর কাছে গিয়ে বসল। উসখুস করছিল কিছু বলবার জন্যে, শেষে কষ্টে ফিরিয়ে এনে বলেছিল, একটো কথা বুলতাম কত্তা। উই যে সেই—'মুনের মধ্যে ডুব দিলে তুর মিলবে ওরে পথের দিশে' উই রকম গান শিখার বড় সাধ।

সাধন মাঝি একবার ওর দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিল, একটু হাল্কা সুরে বলেছিল, হ্যাশ্‌ শ্যালা, উ সব আবার গান না কি রে, উ সব তো বোরেগীদের গান, উতে তুর কাজ নাই। বোরেগী হতি হলি আগে শরীলটার মায়া কাটাতি হয়, তু শ্যালা শরীলটা লিয়েই দিশেহারা, শরীলটার সুখ সাধের ল্যাগেই তো ঘর ছেড়েছিস আর বোরেগীরা ঘর বাঁধবে বুলেই ঘর ভাঙে। তুর আলকাপই ভালো।

কিন্তু কত্তা, আলকাপে বড় খিস্তি খেউড়, মনে বড লাগে।

শ্যালা ধম্মপুত্তুর! দিনরাত তো মনে মনে খিস্তি খেউড় করিস তখুন মুনে লাগে না, আর শুনলে যত দুষ? তু পুখোরের পাক পানাই দেখলি, শালুপদ্ম দেখলি না। আরে শ্যালা, উই পাঁক-পানা আছে বুলেই তো পদ্ম শালুখ ফুটে। গঙ্গার ঘোলা জলটাই দেখলি আর মুখ ঘুরালি, বেটা জলটা থিতাতে দে না, গঙ্গার টলটলে জল, গঙ্গামাটি দুই যে মিলবে। শুন, ই সব দেখার দিষ্টি চাই, বুঝলি। পরের মুখে ঝাল খেলি ঠকতি হবে।

সাধন মাঝি একটা ছড়া কেটে বলল—

দেখ কাণ্ড, বিষভাণ্ড, বিষের ক্ষতে দণ্ডে সুখ
সুধা ভাণ্ড, ভাবকাণ্ড, সুধার লেগে বিষের দুখ।

উ শ্যালা রাজবংশীদের তু ভজন পুজনে সুখ দিতি পারবি না। উই তত্ত্বকথা অরা বুঝবে? শুন, যার যেমুন লিশে তাকে তেমুন দিশে দিতে হয়।

তারপর থেকে রসিক আর কিছু বলত না। বুঝতে পেরেছিল, এ মানুষটার জ্ঞান বুদ্ধি অনেক, অনেক দেখেছে শুনেছে। গালমন্দর মধ্যে দিয়ে অনেক খাঁটি কথা, বুঝ কথা বলে, নিতে পারলে সেই সবই মণি মাণিক্য। সেই বৈরেগী বাবাজীর গানের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আর ঐসব গান শিখেই বা কি হবে? ও নিজেই যার অর্থ বুঝতে পারে না, তার গাঁয়ের মুখ্যুসুখ্যু মানুষরা কি বুঝবে? তাই সে সর্বদা সাধন মাঝি কাকে কি বলত, বুঝতে চেষ্টা করত।

গানের ফাঁকে ফাঁকে রসিক মাঠে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। একা একা বেড়াতে বেড়াতে তার মনে নানা সুর গুনগুনিয়ে ওঠে। ও সুরে সুর মিলিয়ে নানান্ ছড়া বাঁধে। একাকী গুনগুন করে গেয়ে বেড়ায়। কখনো দলের ছোকরারা সাথ ধরে, নানান্ গল্পে তখন সময় কাটে।

দিনে দিনে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়েছে, তাকে নিয়ে গ্রামে, দলের মধ্যে পাঁচ কথা হয়। তার সম্পর্কে সকলের মধ্যে একটা চাপা কৌতূহল আছে। সেদিন দলের ছোক্‌রা পবনের সঙ্গে গল্প করতে করতে ঐ সব জানতে পেরে সে অবাক হয়েছিল। একটু ধমকে জিজ্ঞেস করেছিল, তু কি করি জান্‌লি?

প্যাচাইয়ের ধারে পবন রসিকের গা ঘেঁষে বসেছিল। অমন ছিপছিপে সরল ছেলেটাকে রসিকের ভালো লাগত। ছেলেটার শেখার আগ্রহ আছে, শেখালে মন দিয়ে শেখে। প্রথম প্রথম ওর গায়ে পড়া ভাব দেখে বিরক্ত হয়েছিল, পরে বুঝেছিল, ওর প্রকৃতিটাই অমন, তাই মেনে নিয়েছিল।

রসিকের প্রশ্নে পবন মুখ তুলে বলেছিল, ওসিকদা, ইয়ার আবার জানাজানির কি আছে, সক্কলেই কয়। আর মতিঠাক্‌রোণের চোখে না ধরলি তো তুমার গান শিখাও হত না, অন্য জনার মতো সাধন মাঝি তুমাকেও দূর দূর করি খেদায়ে দিত।

এ কথা রসিকেরও বুঝতে কষ্ট হয় নি। তাকে মাথা নিয়ে মতিঠাকরুণের সঙ্গে সাধন মাঝির ক'দিন মন কষাকষি চলেছিল। এ নিয়ে ওর মনেও অস্বস্তি ছিল, শেষে একদিন মতিঠাকরুণের কথায় ওর মনের ভার কেটে যায়।

তালিমের পর নিত্যদিনের মতো সেদিনও রাতে সাধন মাঝি পূব পাড়ার দিকে চলে গিয়েছিল। কোথায় যায় কি জন্যে যায়, এত খোঁজ খবর নিয়ে রসিক মাথা ঘামায় না। ও দাওয়ায় বসে আপন মনে গুন গুন করে গান গাইছিল। হঠাৎ পিঠে আচমকা একটা ধাক্কা খেয়ে চমকে উঠে দেখে, মতিঠাকরুণ পৈঠায় দাঁড়িয়ে ফুলে ফুলে হাসছে।

কার কথা ভাবছিলে গো, সি মুনের মানুষটো কে বটে?

ক'দিন থাকতে থাকতে মতিঠাকরুণের হাসি ঠাট্টায় রসিক অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। ওকে অমন হাসতে দেখে একবার বলতে ইচ্ছে করল, তুমি, তুমি ঠাক্‌রোণ, তুমার কথাই ভাবছিলেম, বুঝতে পারো নাই? তারপর কি ভেবে সামলে নিল, বলল, মুনের মানুষ আবার কি, মা'ঝি কুন্‌ঠে গেল, একা একা পালার কথা ভাবছিলেম।

হুঁ, তাই বটে, তা মাঝির জুড়ি তুমি, মাঝি তুমায় লিয়ে গেল না বড় ?

কুন্ঠে লিয়ে যাবে ?

রসিকের গায়ে আর একবার ঠেলা দিয়ে বলল, হ্যাকা, পালা গাইবে আর রং চড়াবে না। বাঁশীর খপর রাখবে না, ইয়ার মধ্যি বেশ ভড়ং শিখেছ লাগছে ? হ্যাঁ গো, ও তুমাদের মদ গাঁজার আড্ডায় যায়। গান শিখি লায়েক হতি চাও আর ই সব না করলি চলবে কেনে ? ভিতরে উ সব একটু না পড়লে বুকে খুশি ফোটে না, মুনে অঙ্ ধরে না, আর অমুন পাঙ্সে মুন লিয়ে গানও জমে না, বুঝলে ? তা ইবার তো শুনলে, এখুন যাও, একটু লিশা করি এসো, দেখবে কেমুন গলায় গান ছোটে।

রসিক অবাক হয়ে মতিঠাকরুণের দিকে তাকিয়ে বলে, ঠাক্রোণ, তুমি তো লিশা কর নাই ?

রসিকের চোখে বিস্ময় দেখে মতিঠাকরুণ খিল খিল করে হেসে ফেলে, হ, ঠিক ধরিচ, লিশাই বটে। তারপর সুর দিয়ে বলে, এ লিশায় বুক ভরে না, এ লিশায় মুন ভরে না, এ লিশায় পিরীত সুখের জ্বালা! বুঝলে, ছাই বুঁঝলে। অমুন শরীলটায় কি এতটুকু রসকষ থাক্তি নাই ?

তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে বলেছিল, তা তুমার গানে দরদ দেখে মাঝি কি বুলছিল, জানো ? বুলছিল, না বউ, তুর লজর আছে, তুর চিনায় কুনো গোল নাই, মানুষটো সাচ্চা বটে।···

মতিঠাকরুণ রসিকের দিকে তাকিয়ে ভ্রুভঙ্গি করে বলে, ইস্, সাচ্চা, বুললেই হল, সাচ্চা হবে তো চোখে অমুন খাই-খাই ভাব কেনে, পেল্লাই গতরে অমুন ডাকাবুকো তিষে কেনে ? ভাবলেম মাঝিরে বুলি, হ রাখ তুমার ঐ সাচ্চা মানুষ, তুমার ঠেয় অমুন হ্যাতাপানা আর মাইয়া দেখলে লি লি করি ছুটি আসে। বুললে ঠিক হত। তুমার গানের লিশা ছুটি যেত। তা কি বুলব, তুমার ঐ মুখটাই আমার কাল হল, অমুন হাঘরে মুখ দেখলি সব ভুল হয়ি যায়।

রসিক কিছু বলছিল না। মতিঠাকরুণের দিকে তাকিয়ে হাসছিল।

হঠাৎ মতিঠাকরুণ ওর পাশে পা ছড়িয়ে বসে আব্দার নিয়ে বলে, মাঝিরে তো জবর রকম দক্ষিণে দিলে তা আমার পাওনা কি দিবে বুল ?

সেদিন সেই নির্জন সান্নিধ্যে মতিঠাকরুণের নিঃশ্বাস বুক ছুঁয়ে যাচ্ছিল। ঠাকরুণের আব্দার বুকের মধ্যে সাড়া তুলছিল। রসিকের খুব ইচ্ছে করছিল, ঠাকরুণের হাতটা মুঠোয় তুলে নেয়। শেষে গভীর স্বরে বলল, ঠাক্রোণ, আমার

আর কি আছে বুল? তুমার কিসে সুখ জানি না, তুমার সুখের জন্যি আমি সব করতি পারি।

কিরে করছ?

কিরে কেনে, বিশ্বেস হয় না?

বিশ্বেস হবে না কেনে, তা মাঝির সাথি বেইমানি করতি পারো?

রসিক চমকে ওঠে। ঠাকরুণের চোখের দিকে তাকিয়ে অবাক, সেখানে একরাশ কৌতুক ছটফট করছে। কথাটা সত্যি না চালাকি, রসিক বুঝতে পারে না। ও ভেতরে ভেতরে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

রসিকের হাবভাব দেখে মতিঠাকরুণ হাসিতে ভেঙে পড়ে, কি গো, ভীষণ বিপাকে পড়লে লাগছে? দূর, তুমি ঠাট্টাও বুঝ না। মাঝি তো আমারও গুরু, সোয়ামি না, উয়ার সাথে বেইমানি করতি বুলতে পারি? আসলে, তুমার ঠেয়ে অমুন পীরিতির কথা শুনতি ভাল্ লাগে, সুখ পাই। উ-ই জন্যি বলমু। আর অত সুখ এ পুড়া কপালে সহ্যি হবে কেনে!

তারপর সুর পাল্টে বলেছিল, শুনো, উ সব লয়, তুমায় একটো কথা দিতি হবে, মাঝে মধ্যি আমার কথা শুনতি হবে, না বলতি পারবা না। বুল, কথা দিলে?

রসিককে নিশ্চুপ দেখে মতিঠাকরুণ ম্লান হেসে আবার বলল, ভয় নাই, গুরুর সাথি তুমাকে বেইমানি করতি বুলব না। কাঁদতি বুললে কান্দবে, হাসতি বুললে হাসবে, খেতি বুললে খাবে, কি - কথা দিচ্ছ?

রসিক মতিঠাকরুণের দিকে তাকিয়ে আবেগ নিয়ে বলে, ঠাক্রোণ, ই শরীলটা তো গুরুরে দক্ষিণে দিইচি, উয়া বাদে তুমাকে সব্বস্বি দিলেম। ই বয়সে হরেক রকম ম্যাইয়েই তো চোখে পড়ল, তুমার মতুন কাউকে মুনে পড়ে না। তুমার কথায় সুখও হয়, ভয়ও হয়। তুমায় বুঝা ভার।

সে রাতে মতিঠাকরুণের সঙ্গে কথাবার্তায় রসিকের মনের অস্বস্তির কাঁটা সরে গিয়েছিল। মতিঠাকরুণ ঝগড়া করলেও, সাধনমাঝি যে তাকে পেয়ে খুশি, এটা তার কাছে মস্ত খবর। তাই সেদিন প্যাচাইয়ের ধারে বসে পবনের কথা শুনে অবাক হয় নি। বরং পবনকে বলেছিল, মতিঠাক্রোণের চোখে লাগছে, ই আমার কপাল, তা লিয়ে কথা ওঠে কেনে, ইয়াতে তো কাউর কুনো ক্ষেতি নাই, তবে?

পবন রসিকের কথা শুনে বলে, ক্ষেতি নাই, তুমায় বুললে কে? আর সব্বাই জিভ লিক্ লিক্ করি বেড়ায় আর তুমি সাঁটিয়ে লিচ্ছ, সক্কলের সহ্যি হবে কেনে?

লিক্‌লিক্ করি বেড়ায়. ই আবার কেমুনধারা কথা ?

হ, অরা কয়, মতি ঠাক্‌রোণের গতর লধর গাইয়ের মতু লাদুস্ লুদুস্, ই দু-হাতের পাখনায় উয়ার কলস-পাছা বেড় পড়ে না, উয়ার সব্বসি চেটেপুটে লিয়েও অঙ্গে জ্বলুনি থামে না, খাই মেটে না। অমুন একটো জব্বর মাল তুমি একাই—

পবনের কথা শেষ হয় না। রসিক আচমকা ওর মুখের ওপর একটা চড় কষিয়ে দেয়, চিবিয়ে বলে, তুদের লজ্জা করে না, গুরুবউ লিয়ে মস্কা করিস, সম্পটক্কা খতিয়ে ভাবছিস্ ?

রসিকের রাগ দেখে পবন হতবাক হয়ে গেছে। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, ওসিকদা, তুমি আমায় মারলা, ই সব তো আমার কথা লয়, উয়ারা যা কয়, বলমু, তুমি জিজ্ঞাসলে বুলেই—।

রসিকের রাগ একটুও কমেনি, তেমনি ঝাঁঝ নিয়ে বলল, রাখ রাখ, তুর ফ্যাচফ্যাচানি রাখ, উয়াদের কথা তো উয়াদের ঠেয়েই যা, বেবো—রসিক ওকে ঠেলা মেরে উঠে পড়ে।

সেদিন প্যাচাইয়ের ধার ধরে হাঁটতে হাঁটতে ওদের কথাগুলো বার বার মনে পড়ছিল। রাগে ওর শরীর জ্বলছিল। গা হাত পা নিশপিশ করছিল। ও ওদের উদ্দেশ্যে ভেতরে ভেতরে চিৎকার করছিল, শালা হারামী, কুত্তা, ভেড়ুয়া।

ঘরে ফিরে ও গুম্ মেরে বসে ছিল। মতিঠাকরুণ দু-একবার ঘুরে গেছে, ও ফিরে তাকায় নি। দূর থেকে মতিঠাকরুণের খুক খুক হাসি শুনেছে। গা জ্বলে উঠেছে। কোন সাড়া শব্দ করে নি।

এক সময় মতিঠাকরুণ এগিয়ে আসে। ঠাট্টার সুরে বলে, কি হইচে ?

রসিক একই ভাবে বসে থাকে, সাড়া দেয় না।

হুঁ, মুখটো অমুন হাঁড়িপানা করি রাখচ কেনে, আগ হইচে ?

রসিক একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নেয়।

বেশ বেশ, আগ হইচে ভালো কথা. দুটো বেশী করি খাইও, আস।

রসিক মেজাজ নিয়ে বলে, খিদা নাই।

হুঁ, ইয়ার মধ্যে ভাত কাপুড়ের ঠাঁই করি লিয়েচ, ভালো কথা। তা সে ম্যাইয়ে দেখতি কেমুন, আমার চে ডাগর বটে ?

মতিঠাকরুণকে ঠোঁট কেটে হাসতে দেখে রসিকের আর সহ্য হয় না। ও ঝাঁঝ নিয়ে বলে ওঠে, ভাবো কি আমারে ? আমি কি হাট ঘাট শুধু ম্যাইয়ে খুঁজি বেড়াই ? লোকে শুনলি বুলবে কি ?

হায় হায়, লোকে আর কি বুলবে, উয়াদের কথায় কি যায় আসে? ইয়াতে তো দুষেব কিছু নাই, তুমার বয়সে ডাগর ম্যাইয়ে খুঁজবা না তো কি ঢল্‌কা বুড়ি খুঁজবা?

বসিক ওকে থামিয়ে দেয়, তুমার অসিকতা বাখ, উ সব ভাল্লাগে না। আব ইযার জন্যি তো লোকে দশ কথা কয়। তুমি ঘবে থাক শুনতি পাও না, আমার মাথা কাটা যায়। তুমার সম্পক্কে অবা উ সব বুলবে কেনে?

মতিঠাকবণ তেমনি ঠোঁট টিপে হাসে, কি বুলে?

হাস নি তুমি, ভিন্‌গাঁ না হলি সব শালাব মাথা লিযে লিতাম।

ইস্‌, কি আমার মবদ বে মাথা লিযে লিতাম। অবা কি বুলেচে কি, ফষ্টিনষ্টিব কথা? কেনে, মিছে কিছু বুলেচে? ফষ্টিনষ্টি কর না, লুক কবি তাকাও না, আমাব আপলা গা দেখাব জন্যি ছুক ছুক কবি বেড়াও না, চলতি ফিরতি আমাব বুক কোমুরে তুমার চোখ পড়ে না, কথা বলতি বলতি মিটি মিটি হাস না, অবা ঠিকই বুলেচে। তুমি কবতি পারো আব অবা বুলাতি পাববে না। ভড়ং।

মতিঠাকরুণেব কথা শুনে রসিক অবাক হযে গিয়েছিল। ঠাকরুণ বুলচে কি? বসিক ফষ্টিনষ্টি কবে, লুক কবি তাকায়, ছুক ছুক কবি বেড়ায। বসিক ঠাকরুণেব চোখের দিকে তাকিয়ে দেখে, সেখানে এতটুকু কৌতুক নেই। তাকে কি বকম যেন নির্বিকার লাগছে। বসিক কি বলবে ভেবে পায় না। ও কেমন যেন চুপ মেরে যায়।

হঠাৎ দমকা হাসিতে মতিঠাকরুণ ভেঙে পড়ে, হ, ইবাব তুমায় পুরুষ বলি মন হচ্ছে। অমুন জ্বালুনি না থাক্‌লি আবার পুরুষ! তা, বাপু, শুধু জ্বালুনিতে তো মরদ হওয়া যায় না, আখাম্পা হতি লাগব। তুড়ি দি উ সব গালকথা উড়ায়ি দিবা, তা না হলি মরদ? বাড়ি এয়ে তুমি আমার উপর আগ শানালে, কেনে, উয়াদের দশ কথা শুনায়ি দিতি পারলা না? উ সব কুত্তাকে লেই দিতি নাই, পেয়ে বসবে। আর তুমার মুনে তো কুনো পাপ নাই, তাঅলে অত প্যানাই প্যানাই কেনে? খুব হইচে, এখুন চলো, খায়ি লাও।

মতিঠাকরুণের কথা শুনতে শুনতে রসিকের বুকটা হাল্কা হয়ে আসে। জ্বালা থেমে এক ধরণের স্বস্তি পায়। সত্যিই তো, মনে পাপ নাই তো তাঅলে অত ভাবনা কিসের? আসুক না এক্দিন কিছু বুলতে, টুটি ছিঁড়ে লিব।

রসিক এক ধরণের তৃপ্তি নিয়ে উঠে পড়ে।

এদিকে দিনে দিনে তার তালিম চলে। এখন ও ছড়া বাঁধতে পারে, তর্ক হলে ছড়া কেটে মুখের মতো জবাব দেয়। বছর ঘুরতে না ঘুরতে আশেপাশের দলে কানাঘুষা শুরু হয়েছে, সাধন মাঝির জুড়িদার এতদিনে মিলল।

এই ক'মাস সাধন মাঝি কোন বায়না নেয় নি। ওর এখন কাজ হল রসিককে পাকা মাস্টার করে তোলা। ও রসিককে গান গেয়ে গেয়ে আলকাপের রঙ্ রেপে, কবির রকমফের বোঝায়। বাজনার বিভিন্ন তাল দেখায়, তেহাইয়ের বড় বড় বোল শেখায়।

রসিক অবাক হয়ে দেখে, অমন রোগা পল্‌কা মানুষটা কি ক্ষমতা রাখে। জানে কত! এই বুড়ো বয়সেও লোকটার তাল লয়ে এতটুকু ভুলচুক নেই।

ও যেন কিসের নেশায় গান শিখে চলেছে। এখন ও দল চালায়। সাধন মাঝি দাওয়ায় বসে বসে দেখে, বাহবা দেয়, ভুল হলে গালমন্দে গুষ্টির শ্রাদ্ধ করে ছাড়ে।

সারাদিন মাঝির সঙ্গে বড় একটা কথাবার্তা হয় না। ঘর উঠানে খড়মের খট্ খট্ শব্দে মাঝির উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। বেশীর ভাগ সময় বিড় বিড় করে শ্লোক আওড়ায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ঠাকুর ঘরে বসে থাকে কিংবা লেবুতলায় পাটি পেতে কি সব শাস্ত্র পড়ে। গানের সময় ছাড়া অন্য সময়ে মাঝির সঙ্গে কথা বলতে কেমন দ্বিধা হয়, ঠিক সাহস হয় না।

তবে লক্ষ্য করেছে সকালে ঠিক নিয়ম করে মতিঠাকরুণ মাঝির কাছে গিয়ে বসে। ঠাকুর ঘর থেকে তখন ধূপ ধুনোর গন্ধ বেরোয়। মাঝি সুর করে কি সব পড়ে আর ঠাকরুণ গলকাপড়ে ভক্তি নিয়ে বসে থাকে। সকালের সেই কয়েক ঘণ্টা ঠাকরুণকে কেমন অন্য রকম লাগে। কেমন যেন অন্যমনস্কর মতো চলা ফেরা করে।

একদিন শুধু চোখে চোখ পড়তে ম্লান হেসে বলেছিল, কি দেখ অমুন করি?

ঠাকুর ঘরে তুমায় কি রকম যেন মুনে হয়।

মতিঠাকরুণ ছড়া কেটে বলেছিল, কামনা-বাসনা-ভোগ, সুখ নাহি কয়। গুরুর চরণে তাই সঁপেছি হৃদয়। সাধন ভজন করচি, বুঝলে?

রসিক আগ্রহ নিয়ে বলেছিল, তুমার মুন বসে, অমুন ভাবে বসি থাকতি ভাল্লাগে?

ঠাকরুণ মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠেছিল, ই আবার কেমুন কথা, মুন বসবে না কেনে, তাঅলে কি আমি লোক দেখানি বসে থাকি? তুমার কথায় কুনো ছিরিছাদ নাই।

তারপর স্বর পাল্টে বলেছিল, তুমিও গেলে পারো, ধম্ম কথায় মুন ফিরত, অমুন খাই খাই স্বভাব যেত। পরক্ষণেই ঝাঁঝ নিয়ে বলে ওঠে, হ, ধম্ম করলি সব হবে! চোখ বুঁদে নাম লিলেই ঠাকুর সব সুখ মিটায়ে দিবে! বয়সের ধম্ম যাবে কোতি, উও তো সুদে আসলে পুষায়ে লিবে, উখানে কুনো তুকতাক্ চলবে না। তা ধম্মকম্ম করি যদ্দুর ঠেকান যায়! যত্তো সব! বলেই ঠাকরুণ দুপ্‌দাপ্‌ করে চলে যায়।

রসিক অবাক হয়, মতিঠাকরুণকে ঠিক চিনতে পারে না। সবটাই কি মিথ্যে হতে পারে, তাহলে ঠাকুর ঘরে ঠাকরুণকে অমন অন্য রকম মনে হয় কেন? তবে ঠাককুণের বুকে যে একটা জালা আছে বুঝতে পারে। ঐ জালুনিতেই যত গোল, তাই ঠাককুণকে চিনা ভার। এক এক সময় এক এক রকম কথাবার্তা।

রসিক এ সব চিন্তা নিয়ে বেশী মাথা ঘামায় না বরং গানে মেতে উঠতে চেষ্টা করে। মাঝি ওকে অনেক পাতলা বই পড়তে দেয়, বলে, দেখ, খালি পেটে যেমুন ধম্ম হয় না তেমুন মুখ্যু লোক দিয়ি পাল্লা চলে না। শুধু বুকনি দিযি আসর মাৎ করা যায় না, বুদ্ধিও রাখতি হয়। আর গাঁয়ের লোক ধম্ম কথায় মজে বেশী, যত লাগসই দেষ্টান্ত দিতি পারবি তত গানেব চটক বাড়বে, তাই পড়াশুনা চাই।

রসিক গান আর পড়াশুনা নিয়ে সময় কাটায়। প্রথম প্রথম কষ্ট হলেও, বানান করে পড়তে পড়তে এখন সড়গড় হয়েছে, আটকায় কম। ঠেকে গেলে মাঝিকে জিজ্ঞেস করে। এই ভাবে কখনো গান বাজনার তালিমে, কখনো বই পড়ার ঝোঁকে রসিকের সময় কাটে। গান আর পড়ায় কেমন নেশা ধরে যায়। ও আপন খেয়ালে ও সব নিয়ে মেতে থাকে।

মতিঠাকরুণকে খেতে শুতে নজরে পড়ে। আগের মতো অগোছাল বেশ-বাশ, কথায় চটক, শরীরে চমক। মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে। কখনো রসিক অন্যমনস্ক হয়ে থাকলে মতিঠাকরুণ পিছন থেকে গিয়ে ওকে আচমকা ধাক্কা দেয়, রসিক থতমত খেয়ে তাকালে মতিঠাকরুণ নিঃশব্দ হাসিতে ভেঙে পড়ে।

তারপর হাসি সামলে বলে, তুমি নাকি মাঝির মুনমতো জুটি হইচ, জবর, গাইচ, তা আমায় গান্ শিখাবে, ছোকরাদের যেমুন করি হাত ধরি ধরি লাচ শিখাও, আমায় লাচ শিখাবে?

রসিক অবাক হয়ে বলে, কেনে, মাঝি থাকতি আমার পরে দয়া?

দুস্, ঘেটে বুড়োর কাছে গান শিখে নাকি, না লেচে সুখ? সোমত্ত ম্যাইয়েকে লাচগান শিখাতে জুয়ান মরদ চাই, তা শিখাবে নাকি?

রসিক মজা করে বলে, শিখতি পারবা তো, পারছি না বুলতি পারবা না।

মুহূর্তে মতিঠাকরুণ লাফিয়ে উঠে গাছকোমর বেঁধেছিল, তেজী ভাবে শরীর চিতিয়ে বলেছিল, ইস্, পারছি না বুলব, আস না, দেখি কে হাঁপায় ?

রসিক অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিল, এ আর এক ঠাকরুণ, সমস্ত দেহটা পাকা কঞ্চির মতো শানিয়ে উঠেছে, চোখ মুখে রঙ ধরেছে, কোমর বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঐ শরীরের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। গোড়ালি বেড়িয়ে থাকা মসৃণ পা, আঁটোসাঁটো কোমর, টানা বুক, তেজী ঘাড়, চোখা মুখ চোখ—সব মিলিয়ে মতিঠাকরুণকে দারুণ লাগছিল।

রসিককে অমন করে তাকিয়ে থাকতে দেখে ঠাকরুণ ভ্রূভঙ্গী করে বলে ওঠে, হুঁ, বুঝা গেছে, কেমুন মরদ, বাখানি তো খুব, আগুচ্ছ না কেনে।

মতিঠাকরুণের ঝাঁঝ দেখে রসিক হেসে ফেলে, তুমার সাথে পারা যাবে না, উ আমার কম্ম লয়, তুমায় তালিম দেওয়া মাঝির কাজ, মাঝিই পারবে, বুলব ?

ঠাকরুণ কাপড় ঠিক করতে করতে বলে, থাক, খুব হইচে, মাঝিকে আমিই বুলতে পারব, তুমার দরকার হবে না। তুমি উই ছোকরাদের গান নাচ শিখাও, মানাবে ভালো। আমায় ভূতে কিলাচ্ছেল তাই তুমায় বলতে গেছি।

ঠাকরুণ সেদিন আর দাঁড়ায় নি, চলে গিয়েছিল।

কোনদিন আবার চোখ মটকে বলে, ইস, কি আমার পুরুষ রে, গান শিখে লায়েক হবে! হুঁ, যি বয়সে যি গান, তুমি বাপু জোয়ান মদ্দ, কোদাল চালাবে, কাঁখে বউয়ের গতর লিবে, মেয়েলোকের শরীলে তুমার উই বাঘা বাঘা হাতে খাবলে খাবলে সুখ কাড়বে তা লয় উই হারমনিয়াতে প্যাঁ প্যাঁ গান বাঁধছ! ই সব গান বাজনা উই ঘেটে বুড়ো মাঝির জন্যি। তুমি তো বাড়-বাডন্ত মেয়ে বুকে গান বাঁধবে, জিয়ানো শরীলের গান।

রসিকের এখন আর মতিঠাকরুণের কথাগুলো বুঝতে কষ্ট হয় না। তারও তো জোয়ান বয়স, অনেক পুরুষের থেকেও ওর শরীর তাজা, কুঁদে কুঁদে তৈরি ছাতি। কিন্তু ওর এখন আর কিছুতে লোভ জাগে না। অত ঠাট্টা, ওর পৌরুষ নিয়ে অত টিটকারি ওর মনে এতটুকু রেখাপাত করে না। সেই বৈরাগী বাবাজীর মতো ও কাছিমের কামড় দিয়েছে, ওকে গান শিখতেই হবে।

আজকাল ও মতিঠাকরুণের সঙ্গে হেসেই উত্তর দেয়। কখনো ছড়া কেটে জবাব দেয়। কতদিন রাতে ঘুম ভেঙে মতিঠাকরুণের কান্না শুনেছে। সাধন মাঝিকে গালমন্দ করতে শুনেছে।

কোন কোন দিন মাঝি ফিস ফিস্ করে বলে, বো, দেখ্ আমার তিনকাল যে এককালে ঠেকেছে, অনেক দেখনু, বুঝনু, উ সব জ্বালা জ্বালুনি কিছু লয়, সমুদ্রের টান, জুয়ার ভাঁটির মতু, এই আছে এই নাই, মুনে লিলে অনেক, না লিলে কিছু লয়। অঙ্গের সঙ্গে সম্পক্ক, যতক্ষণ জোর ততক্ষণ জ্বালুনি, তাপর হেলে সাপের মতুন লেতিয়ে পড়ে। উ শরীলে আর কুনো কাজ হয় না। দেখবি, যতো সাধু সন্নেসি সব জুয়ান বয়সে সাধন জুড়েচে। আমাদের যৈবন হল ব্যাঙের আধ্লি, চাইলেই খরচ রাখলে সুখটো হাতের মুঠায়। তখুন সুখের জন্যি আর হাপিত্যেশ করতি হয় না। তাই বলি বো, মুন বাঁধ, ধম্মে মুন দে, তাতে অনেক শান্তি, অনেক সুখ পাবি।

মতিঠাকরুন মুখ ঝামটা দিয়ে বলে ওঠে, থাক, ঢের হইচে, ই সব কথা তুমার উই হাবা চ্যালাদের বুল, অরা শুনবে, আমারে আর শুনাতে এসো না। সিই বিহার দিন থেকি শুইনা আসচি ; ধম্মে যার মতি নাই তার মুক্তি নাই। বো, ধম্মেকম্মে মুন দে, আঁত্তার শান্তি হবে। কে তুমায় আঁত্তার শান্তির কথা বুলতে গেছে ? দুহাই তুমার, আমার সুখের লেগে অতটি ভেব না, ঢেরদিন হল, তুমার উ সব বুকনি আর ভালো লাগে না।

বেশ, আমার কথা না মানিস তো, শাস্তর কথা তো মানবি ? গল-কাপুড়ে যে দেবদেবীর পায়ে পেন্নাম করিস, তা কুনো দেবতাকে কি বুড়ো হাবড়া দেখছিস, না কুনো পিরতীমেকে বুড়ি বুলে মনে হয় ? বুল ? উযাদের যৈবন আছে বুলেই দেবতা, যৈবন বাঁধতি পারলি অমন পিরতীমে হওয়া যায়।

তা বাঁধলে না কেনে, তুমারও তো একদিন যৈবন ছেল, তখুন তো ই সব কথা ভাব নাই, দিব্যি ম্যাইয়া জুটায়ে সুখ কেড়েছ আর আমারই বেলায় ধম্মকম্ম ! যৈবন আছে বুলেই দেবতা লয়, যৈবন হল তুমাদের মতু হাবড়াদের ধরি রাখার জন্যি। পিরতীমে পূজো লয় তো যৈবন পূজো—তিনকাল যে শ্যাষকালে তো আর জ্যান্ত পিরতীমে ভজন করার ক্ষেমতা নাই, তাই মুনে মুনে পিরতীমে সাজিয়ে সাধন করা, উয়াতে যত্টুকুন মেলে ! তুমার কালে উয়াই সয় কিন্তু আমায় বুলতে আস কেনে ?

তারপর অনেকক্ষণ মাঝির কোন সাড়াশব্দ শোনা যায়নি। শেষে এক সময় অনেক ক্লান্তি নিয়ে বলে, বো, তুর কথা যি আমি বুঝি না তা লয়, কিন্তুক ই বয়সে আর উ সব ভাল্লাগে না। কদিন ভেবেছি, ঘর তুর ছাড়ি কুথায় চলি যাই, একা থাকতি থাকতি তুর হয়তো একটো হিল্লে হইয়ে যাবে, কিন্তু তুকে কি

বুলব, তুকে ছাড়ি যাবার কথায় বুক কাঁপে, মুন কাঁদে। তুদের গাঁয়ে গান করতি যে, কী দেখি তুর বাপের হাতে এক কাঁড়ি টাকা দি তুকে লিয়েছিলেম, বুলতে পারি না। তখুন এতসব ভাবি নাই, ভিটে খাঁ খাঁ করত তাই একটো মানুষের দরকার ছিল। কিন্তু তুকে ঘরে আনার পর, তুর সঙ্গি থাকতি থাকতি, তুর আঁচটা গায় লাগতি লাগতি তুর কেমুন বশ হইও গেছি। তু বিশ্বেস কর, কুথায়ও আর যেতি মুন চায় না। বায়না লিয়ে কুথাও গেলি আর তর সয় না, খালি চিন্তে, কখুন ঘরে ফিরব। যিখানে যাই মুনটা এই ঘর দাওয়া, ঝাড় ঝোপ, তুলসী তলে তুর পাছে পাছে ফেরে। তুর কথা ভাবতি ভাবতি কদ্দিন পালা পাল্টে যায়, হুঁশ থাকে না। তাই তুকে ছাড়ি চলি যেতি পারলেম না।

আর দেখ, আমার কপাল, লয়তো যে যা বুলেচে, সিখান থেকিই মাদুলি তাবিজ লিয়ে এইছি, অনেক আছবিচার করে তুর গলায়, কমরে পরিয়েচি, এত লোকের ফল হল কিন্তু আমার বেলায় সব মিথ্যে, কাজে কিছুই এল না।

বো, তুর কথা আমার বুকে বাজে, তুর কষ্টটা বুঝি, কিন্তু চাইলেই তো আর ই গাঁটছড়া খুল্যা ফেলা যায় না। তু ঠিকই বুলেছিস, আমার আব কি, তিনকাল যে এককালে ঠেকেছে, মরণ কালে এক ফোঁটা জল জুটলেই অনেক, কিন্তু তুর যে সবটাই বাকী! তুর ল্যাগে আমার বড় চিন্তে, তুর কিছু একটো হলে আমি শান্তি পেতেম। শেষে এক সময় বলেছিল, বো, তু আর কারুর সঙ্গি পালায়ে যা, লয়তো কণ্ঠী লে, উয়াতে কুনো দুষ লাগে না।

মতি ঠাকরুণ খেঁকিয়ে উঠেছিল, কি আমার সোয়ামী রে, লিজের বোকে লষ্টা হতে বুলতে নজ্জা হয় না? বিহা করার সুময় বোয়ের সুহাগ গতরের কথা ভাব নাই কেনে? দুহাই তুমার, অমুন দরুদের বাক্যিগুলান শুনাইও না, তুমার উ সব সাধের কথা সহ্যি হয় না। আমার জন্যি বুক কাঁপে, মুন কাঁদে ই সব শুনে আমার কি লাভ? তার আর যিখান যিখান থেকি পারো মানত করি ডোর, লিয়ে এসো, গতরে সহ্যি হবে, উ সব লিয়ে বেশ থাকব, তুমারও চিন্তে কমবে। তারপরেই মতিঠাকরুণ ডুকরে কেঁদে উঠেছিল।

সেদিন সকালে রসিক মতিঠাকরুণকে ঠাট্টা করেছিল, হাসতে হাসতে বলেছিল হ, কাল রেতে কি হলছেল, খুব যে বুড়োকে লিচ্ছিলে, তুমার না উ সোয়ামি হয়!

কথা শুনে মতিঠাকরুণের মেজাজ বিগড়ে যায়, গালমন্দ করে বলে, তুমার নজ্জা করে না, রেতে পরের বো-ভাতারের কথায় আড়ি পাতো? আজই বুলব, দূর করি দাও উই ডাকাবুকো শয়তান মিন্ষেকে। যার খাবে তারই দুষ গাইবে! যাও, ইবার তুমার ইয়ারদের বুলগে, কাল রেতে মতিঠাকরোণ সোমত্ত বয়স, ডাগর বুকটা লয়ে জ্বলছেল আর উই অকম্মা বুড়োহাবড়ার বুকে শুয়ে কান্দছেল, কাজিয়া করছেল—

সেদিন কাঁদতে কাঁদতে মতিঠাকরুণকে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল রসিক। ঘটনার আকস্মিকতায় সে কি যে করবে বুঝতে পারে নি। অনুভব করেছিল, মতিঠাকরুণের খুব দুর্বল জায়গায় ও ঘা দিয়ে ফেলেছে।•

ক'দিন বাদেই পূর্ণিমা। চাঁদের আলোয় উঠোন থৈ থৈ করছে। মাঝির শরীর ভালো না থাকাতে আসর জমে নি। কিছু পরেই মাঝি উঠে গিয়েছিল। রসিকেরও ভালো লাগছিল না। আর সবাইকে ফিরিয়ে দিয়ে একাকী সে উঠোনে শুয়ে ছিল।

ঝোপ ঝাড়ে জোনাকি জ্বলছে। আশে পাশে কাঁচপোকা ঝিঁ ঝিঁ পোকার বুঁই ই ই, ঝিন্ নি নি ডাক। গাছের লুকানো ডাল থেকে কোন পাখি থেমে থেমে ডাকছিল। আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ চাঁদের আলোয় ভেসে বেড়াচ্ছে। এই সব কিছুর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে মন চায়। রসিক এই সব দেখতে দেখতে, এই সব কিছুর মধ্যে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ মতিঠাকরুণকে কাছে এসে বসতে দেখে অস্বস্তি জাগলেও অবাক হয় নি, ঠাকরুণ অমনই, ও একটু সরে গিয়েছিল শুধু।

ঠাকরুণ বোধহয় চান করে এলো তাই গা থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছে, সাবানের গন্ধ। হাটবারে সাবান আনতে যাওয়ার সময় ঠাকরুণ একটা মোড়ক দেখিয়ে বলেছিল, এমুনটি দেখি এনো, ফুল আঁকা।

হাঁটতে হাঁটতে মোড়কটার গন্ধ শুঁকে দেখেছিল রসিক, গোলাপের গন্ধে ভুর ভুর করছে। লক্ষ্য করে দেখেছে, মোড়কের গায়ে গোলাপের ছবি।

তারপর থেকে সাবান ফুরুলে হাট থেকে ঐ গোলাপী সাবান এনে দিয়েছে। সেই গোলাপী গন্ধ আজও ঠাকরুণের গায়ে। আজকের এই রূপ রঙের চারপাশে মতিঠাকরুণের গন্ধটা কেমন দিব্যি মানিয়ে গেল। গাছ, পাখি, জ্যোৎস্না ইত্যাদির মতো ঠাকরুণকে তেমন কিছু ভাবতে পেরে রসিক সুখ পেল। রসিক শুয়ে শুয়ে সেই দৃশ্যে গন্ধে লালিত হল।

এক সময় ঠাকরুণ বলে উঠল, আমায় এক জায়গায় লিয়ে যাবে?

রসিক অবাক হয়েছিল, ঠাকরুণ কখনো কোথাও যায় নি, নিয়ে যেতে বলে নি। জিজ্ঞেস করেছিল, কোতি?

তাতে কি কাজ, লিয়ে যাবে কি না বুল?

এই প্রথম রসিক অনুভব করল, ঠাকরুণ খুবই অস্থির হয়ে আছে, তাই কথার ঝাঁঝ অত।

ত' কোতি যাবা না বুল তো, কুন্‌দিন যাবা বুলবে তো?

আজই, শ্যাষ পহরে।

এই রেতে! তুমি পাগুল হলি নাকি?

পাগুল হই নাই, হব। তা যাবা কি না বুল?

মাঝিকে বুলেচ?

কেনে, মাঝিকে কিযের ল্যাগে বুলব, বুলে হবেটা কি?

হেই, ই কি কথা, রেতে বাইরে কোতি যাবা, মাঝিকে বুলবা না?

শুনো, আমার এতটান বয়স হল, ক'বছর সোয়ামির ঘর করলেম, কুথাও যেতি হলি যে কত্তাকে বলি যেতি হয়, এ জ্ঞানগম্যি আমার হইচে। এদ্দিন তো বুললেম, বুলে কি হল বুলতে পারো? মাঝির ক্ষেমতা তো জানি, মাঝির ক্ষেমতাটার বহরটা দেখ, বুললে এ্যার চে কি বেশী হবে? মুহূর্তে মতিঠাকরুণ বুকের কাপড়টা ছুড়ে ফেলে দেয়।

ঠাকরুণের গলার স্বর পাল্টানোর সাথে সাথে রসিক ফিরে তাকিয়ে ছিল কিন্তু এমনটি হবে ভাবতে পারে নি। চলতে ফিরতে হাতে দু-একটা মাদুলি নজরে পড়েছে, অনেকেরই থাকে, এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু এই থৈ থৈ চাঁদের আলোয়, পাখি ডাকা কাঁচপোকা ডাকা চত্বরে, নির্জনে মতিঠাকরুণের বুকের দিকে তাকিয়ে রসিক চমকে উঠল, মটর হারের মতো সারা বুক জুড়ে

শিকড় মাদুলির মাল, কোমরে বিছেহারের মতো কড়ি, পুঁথি, নুড়ির বেড়। চাঁদের আলোয় সেগুলো ঝিলিক দিচ্ছিল, বুক কোমরে কেমন থিক থিক করছিল। রসিক আর তাকিয়ে থাকতে পারছিল না, মুখ নামিয়ে নিল।

মতিঠাকরুণ কাপড় সামলে নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, বুল, মাঝিকে বুলে কিছু হবে? মাঝির দোড় উই পয্যন্ত। খুব হইচে, আর না। এই শ্যাষবেশ। শুনচি বিল পাড়ে পাকুড় থানে ভর ওঠে। শেতল মার ঠাই, অনেকের মুন ভরেচে, কোল জুড়েচে। এই শ্যাষ, তারপর সব ছুড়ি ফেলি দেব। তা যাবা কি না বুল?

রসিক মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে মতিঠাকরুণের চোখ মুখ কেমন জ্বলছে। মুখ ফিরিয়ে বলল, কখন যাবা?

ঠাকরুণ উঠতে উঠতে বলল, ঠিক সুময় আমি ডাকি লিব। এখুন খেয়ে লিয়ে ঘুমাও।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই, হঠাৎ একটা মৃদু ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল রসিকের। সেই ঘুমের আবেশের মধ্যে একটা অলৌকিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল, পূর্ণিমার চাঁদ ঢলতে ঢলতে পশ্চিম জানালার বাঁ পা ছুঁয়েছে আর সেই জানালায় পিঠ দিয়ে আলো সর্বস্ব মতিঠাকরুণ দাঁড়িয়ে আছে। ওর পাঁজা পাঁজা চুল ঘাড় বুক পিঠ ছাপিয়ে সারা ঘরময় যেন উড়ে বেড়াচ্ছে। রসিক ঘুমের ঘোরেই এই সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

আচমকা ঘরটা অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় ঠাকরুণের আলো সর্বস্ব দেহটা হারিয়ে গেল। সেই মুহূর্তে কোন বাড়ির ঢেঁকির পাড়ের ঢিক্ ঢিক্ শব্দটা স্পষ্ট হল। রসিক অস্বস্তির মধ্যে উঠে বসে এবং মুহূর্তে জানালার ধারি ছুঁয়ে চাঁদ দেখল, মতিঠাকরুণের আলতো, শরীর দেখল এবং শেষ প্রহরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ওর গা শিরশির করে উঠল।

ওকে আবার কুঁকড়ে বসতে দেখে মতিঠাকরুণ এগিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, আবার বসলে কেনে, উঠ, পহর শ্যাষ হই এলো, ভোরের হাওয়া উঠছে, ঢেঁকিতে পাড় পড়ছে, এখুন না বেরুলে ঘুরতে ঢের বেলা হইঊ যাবে, উঠ।

রসিকের একে একে সব কথা মনে পড়ে যায়। একটু দ্বিধা নিয়ে উঠে পড়ে গায়ে জামা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, মাঝি—?

সি তুমায় ভাবতি হবে না, এখুন চল।

দরজায় শেকল তুলে দিয়ে ওরা পথে নামে। গ্রামের মুখেই সাধন মাঝির ঘর। দু-চারটে বাড়ি পেরিয়ে মাঠ। ওরা দ্রুত সেটুকু পেরিয়ে মাঠে নামল।

চাঁদ মিলিয়ে যেতে যেতে শেষ আলো সারা মাঠময় ছড়িয়ে দিয়েছে, গাঁয়ের গাছপালা ঝোপঝাড়ের মধ্যে চালাবাড়িগুলো কেমন সাজানো সাজানো লাগছে। সব যেন নিশুত নিশুত। কোথা থেকে একটা কু'্ পাখি থেমে থেমে ডেকে চলেছে, কুপ কুপ কুপ। ওদের পায়ের সাড়া পেয়ে ধারের ঝোপঝাড থেকে ঘুমন্ত পাখিরা পাখা ঝাপ্‌টে জেগে উঠল। গাঁ ফিরতি শেয়াল চলতে চলতে ওদের দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগল। এই সব দৃশ্য ছেড়ে রসিক ও মতিঠাকরুণ ছায়াচ্ছন্ন মাঠে একটু একটু করে মিশে গেল।

উভয়েই কেমন চুপচাপ বিলপাড়ের উদ্দেশ্যে হেঁটে চলেছে। ঠাকরুণ আগে, রসিক্ পিছে পিছে। মাঠ দীঘি ছাড়িয়ে পগার ধরে হাঁটতে হাঁটতে চাঁদের আলো ফুরিয়ে এলো। আকাশ জুড়ে তারা, সেই আলোয় আল চিনে চলা।

একটু এগিয়েই মতিঠাকরুণ, ই বাবা—বলেই এক লাফে পিছিয়ে এসে রসিকের গায়ে পড়ল। ঠাকরুণ যেন একটু কাঁপছে।

রসিক ঠাকরুণকে কাছে টেনে উৎকণ্ঠা নিয়ে বলল, কি হল?

পায়ে কিসের খোঁচা লাগল যেন।

হায়, কাটি দেয় নাই তো?

থাক গে চল, উ কিছু লয়।

ই কেমুন কথা, আঁধারে কী কাট্‌তি কী কাটে? দাঁড়াও, শালাইটো বের করি।

শালাই, তুমি আবার বিড়ি ধরলে কব্ থেকে?

উয়ার জন্যি না, রেতে বেরুতে হবে তাই শালাই লিয়েছিলেম।

রসিক সেই সমাচ্ছন্ন প্রান্তরে হঠাৎ মতিঠাকরুণের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। এক হাতে ডান পায়ের গোছা ধরে অপর হাতে পায়ের পাতায় আঙুল ছুঁয়ে দেশলাই জ্বালায়, কুনঠে বুল?

রসিকের তাড়া দেখে মতিঠাকরুণ হাসিতে ভেঙে পড়ে। রসিকের হাত থেকে পা ছাড়াতে ছাড়াতে বলে, হ তুমার 'পরে ভর করা যায়, তুমার 'পরে

সন্ন্যসি ছাডি দিয়ে সুখ, তুমি আঁচটি লাগতি দিবা না। এখুন উঠ, খুব হইচে, কিছু কাটে নাই, পীবিতে কুট্‌ছেল, সি কাঁটা সরাতি পারবা ?

যতক্ষণ দেশলাইযেব কাঠিটা জ্বলছিল বসিক অবাক হয়ে ঠাকরুণের দিকে তাকিযে দেখছিল, এ আবার কেমন ধাবা বসিকতা ? উঠে দাঁডিযে একটু গম্ভীর হয়ে বলল, বেতে ই সব লিযে বঙ কবতি নাই, কী থেকি কী হয ?

রঙ্‌ কবলেম কখুন, ও একটো গুই সাপ লাফাযে গেল, খিযাল হচ্চে।

হুঁ, ম্যাইযালোক লিযে বাইবে বেরুনো ঝকমারি, খুব হইচে, ইবাব আমাব পিছে পিছে এসো।

মতিঠাকরুণ কখনো পিছিযে কখনো সাথে সাথে চলতে লাগল। চলার তাডায তাব হাতেব চুডি বিন ঝিন কবে বেজে ওঠে। রাত জাগা কোন পাখি পিউ পিউ পিউ করে মাঝে মধ্যে ডাক দেয়। অনেকদিন পব বাডিব বাব হয়ে ঠাকরুণের দারুণ ভালো লাগছিল, মনটা খুশিতে ভবে উঠেছিল। ভোরের হাওয়ায় মুখ চোখ শিবশিব কবে ওঠাব মতো ওব বুকেব মধ্যে একটা তিরতির সুখের সাডা জাগছিল, ওব হাবিবে যাওয়া ফেলে আসা সেই সব বাঙানো দিনগুলো মনে পডছিল, ও কেমন কিশোবীব মতো ছটফটিয়ে রসিকেব হাত ধরে টান দিল, এ্যই, চুপ, অমুন কবি ভাল্লাগে না, কি রকুম বুবাব মতু চলেছি। কিছু বুল না, লয়তো গান গাও, এখানে তো কেউ কিছু বুলবে না।

হ বড্ড সাহস দেখি, কেউ বুলবে না। তুমি কারুব বুলাব ধার ধাবো নাকি ?

সন্ধ্যেবেলায যখন মতিঠাকরুণ বাইরে যাওয়াব কথা বলল তখন বসিক সত্যিই কেমন দ্বিধায় পডেছিল, মাঝি কি বলবে ? কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে মতিঠাকরুণের সঙ্গে টুকরো কথাবার্তায়, ছোট্ট ছোট্ট রসিকতায ওব মনটা হাল্কা হয়ে উঠছিল, ও সহজ হতে চেষ্টা কবছিল। সেই ভোব আঁধারে মাঠ ভেঙে চলতে চলতে ঠাকরুণ যখন ওকে গাইতে বলল তখন রসিকের অনেক দিনের একটা লুকানো ইচ্ছে গুনগুনিয়ে উঠল। বসিক ঠাকরুণকে একটু ছুঁয়ে বলল, ঠাকরোণ, একটো কথা কদ্দিন থেকি বলি বলি কবেও বুলা হয নি, যদি কথাটো রাখ তো বুলি ?

সেই অস্পষ্ট আলোয় ঠাকরুণ একবার রসিকের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কথাটোই আগে শুনি, তাপব রাখা না রাখা।

না তুমায় কথা দিতি হবে, বুল ?

ঠাকরুণ রসিবের চোখের দিকে তাকিয়ে থির হল, শেষে একটু অস্পষ্ট ভাবে হেসে বলল, আচ্ছা বুল ?

বেশ একটু আব্দার নিয়ে রসিক বলল, ঠাকরুণ, তেদিন তুমার হাঁকডাক শুনছি, চলতি ফিরতি তুমার গলা শুনছি, বড সখ তুমার একটো গান শুনব, উখানে তো বুলা যায় না, পাঁচজনাব আসা যাওয়া আছে, এখন গাও না, আমার বড় সখ।

কথা শুনে ঠাকরুণ খিল খিল করে হেসে ফেলে, আ আমার পুডা কপাল, ভাবলেম কি না কি বুলবে, ই লিযে এত ধানাই পানাই ! দুর, অমি আবার গান জানি নাকি, গান জানলি কি আব এমুন করি পড়ে থাকতেম, না উই বুড়োর সাথি বে হত ? অমুন সখ এখুন ভুলি রাখ, গান জানা বউ বিহা করে উয়াকে বুকে লিয়ে গান শুনো, সুখ হবে। ভিন্ বৌয়ের গানে কি আর সুখ মেটে ? এখুন লাও, একটো তেমুন পারা গান গাও।

চলতে চলতে হঠাৎ রসিক থেমে যায়। ঠাকরুণের একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে খুব আবেগ দিয়ে বলে, একটো গান গাও না ঠাকরোণ, ইযাতে তুমাব কী ক্ষেতি হবে ? আর তো কুনদিন বলব না ?

মতিঠাকরুণ থমকে থেমে কি যেন ভাবল, বলল, আচ্ছা আচ্ছা, খাবাপ হলি কিছু বুলতি পারবা না।

তারপর গান ধরল। গুনগুন করতে করতে গলা খুলল। একটু একটু করে সেই ঠাণ্ডা শিরশির বাতাসে গানের সুর প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসতে লাগল। সেই নিরালা নির্জন নিস্তব্ধ প্রান্তরে খুব ধীরে চলতে চলতে গানের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া মতিঠাকরুণকে প্রত্যক্ষ করে, তাব গানের আশ্চর্য রকম মাধুর্য অনুভব করে রসিক কেমন যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলল। মতিঠাকরুণের গানের ভাব সুর ভাষা তাকে কেমন আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। ঠাকরুণ কি রকম এক ঢিমে মেজাজে, আবেগ থর থর স্বরে গান ধরেছিল—

মনের কথা কইতে নারি,
মনের মানুষ কই,
ভাবের ঘরের চিনাশুনা
তেমুন মানুষ কই।
যার সুহাগে দিশে লাগে
তিষে কেন মেটে না, সই ॥

মন বেসাতির স্বজন কেন
আপন হল না,
(হায়) দরদী সে সঙ্গ দিল
পরাণ দিল না।
পীরিত জালায় জলে মলেম
সি জ্বালা কেমুনে সই ॥

কখন গানের সুর থেমে গেছে, রসিকের ভাব কাটে নি। সেই গানের সুর ঘুরে ফিরে তার কানে বাজছিল। সে কখন আপন মনেই গুনগুন করতে শুরু

কবেছে—মনের কথা কইতে নাবি/মনের মানুষ কই, যার সুহাগে দিশে লাগে/ তিষে কেন মেটে না সই, পীবিত জালায় জলে মলেম/সি জালা কেমন সই।

মতিঠাকরুণ চুপচাপ রসিকের পাশে পাশে হাঁটছিল। পুব আকাশ অনেক ফিকে হয়ে এসেছে। পাশেব মানুষটাব মুখ চোখ অনেকটা বোঝা যাচ্ছে। মতিঠাকরুণের মনটা ভবে উঠছিল। গানেব আবেশ তখনে কাটিযে উঠতে পাবে নি।

বসিক আপন মনেই গুনগুন কবে হাঁটছিল। সবটা ওব দারুণ ভালো লেগেছে। ঠাকরুণেব গলা যে এত সরেশ ও ভাবতেই পাবে নি। হঠাৎ গান থামিযে দু'হাতে ঠাকরুণকে জড়িয়ে বুকের কাছে টেনে আনে, তুমি এত্তো ভালো গান জানে। ইস্ তুমি না—, আবেগে ওব কণ্ঠস্বব জড়িযে আসে, কিছুই বলতে পারে না।

বসিকেব আলিঙ্গনেব মধ্যে একটু স্থিব থেকে ঠাকরুণ চোখ ভ্রুকুটি ফুটিয়ে বলল, হ ভালো না ছাই, ছাড।

তাবপর ওরা কেমন যেন নীরবে হাঁটতে লেগেছে। একটু গিয়েই দাঁড়া। এক হাঁটু জল। হাঁটু পর্যন্ত বাপড গুটিযে ছপ ছপ আওয়াজ তুলে ওবা পাড়ে উঠল। আর পোয়াটাকে পথ, তারপরেই শেতল থান।

দাঁড়া পেবিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দূব মাঠে দু-চারটে চাষী গৃহস্থ মানুষেব সাড়া পাওয়া গেল। সে সব দিকে তাকিযে ঠাকরুণ হঠাৎ বসিককে বলল, ই মানুষগুলান দেখি কি ভাবছে বুল তো?

ঠাকরুণের চোখে ঠোটে কেমন এক ধরণেব হাসি ফুটে আছে। বসিক বলল কি আর ভাববে, ভাববে থানে চলেচে।

হ, থানে চলেচে. ভাববে তুমি পবের বউকে বার কবি লিয়ে চলেচ।

রসিক বলে ফেলে, ইওতো ভাবতি পারে, মানুষটো লিজের বোকে লিয়ে ঘরে চলিচে?

ঠাকরুণ হেসে ফেলে, কি বুদ্ধি, লিজেব বোকে লিযে চলেচে, সাথে কুনো বাস্কো প্যাটরা নাই, ধরতি পারবা না, মানুষগুলান এতো বুকা ঠাওরেচ।

একটু একটু করে পথ চলতি মানুষের ভিড বাডছিল। চলতি মানুষগুলো থানের দিকেই হাঁটছে। দূর থেকেই ঝাঁকড়া গাছটা নজরে এসেছিল, গাছের মগ ডালে একটা লগিতে লাল নিশান বাঁধা।

শেতলা মার থান আর পাকুড়তলা পাশাপাশি। পাকুড়তলায় একটা দোচালা ঘর। তার মধ্যে ভর উঠেছে।

রসিককে একটু দাঁড়াতে বলে ঠাকরুণ পুকুরে ডুব দিয়ে আসতে গেল। সেই ভিজে শরীর কাপড়ে গিয়ে ভর-মার কাছে ধর্ণা দিতে হবে। ঘরের মধ্যে এক একজন যাচ্ছে, বেরিয়ে আসছে, কারুর মুখে হাসি, কারুর চোখে জল। শীতলা মার থানেও ভিড়, পুজো দিচ্ছে, ভোগ দিচ্ছে। কাছেই দু-একটা মনিহারি ময়রা মুদির দোকান।

চল, ভিতরে যাই।

রসিক ঘুরে তাকিয়ে দেখে ভিজে কাপড়ে ঠাকরুণ দাঁড়িয়ে আছে। শরীর বেয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে নামছে। চোখ মুখ কেমন যেন ভিন্ন রকমের লাগছে।

আমি আবার যাব কেন?

চল না কেনে দেখবা। আর পুরুষ মানুষ সাথি থাকলি সাহস বাড়ে আর তুমার কাছে তো কিছু আগঢাক নাই।

ওরা একটু মাথা খাটো করে চালায় ঢোকে। বাঁধানো পাকুড়তলা ঘিরে চালা। গাছেব গোড়ায় ক'টা সিন্দুর লেপা পাথর। তার পাশে ভর-মা। এই জটা জটা চুল! বোঁ বোঁ মাথা ঘোরাচ্ছে, গঁ গঁ আওযাজ উঠছে। আলুথালু বেশ। ভব উঠেছে মার, ভর উঠেছে। ভর থাকতে থাকতে সব জেনে নিতে হবে। এখন আর বুড়িমা নয়, স্বয়ং শেতল-মা ভর করেছে।

ওরা ঢুকতে ঢুকতেই ভর-মা বিড় বিড় করে বলে উঠল, ই জ্বালা, বিষম জ্বালা, ঘুন পোকার মতু কুরর্ কুরর্ করি কাটে, হবে নি, গতর লিয়ে বড় যে গরব ছেল, দেমাকে মাটিতে পা পড়ত না, এখুন বুঝ, বুকটো জ্বলি জ্বলি থাক হচ্ছে, উই গতরই কাল হল। দূর হ দূর হ। সব আবাগীব বেটি মুখপুড়িরা, এখুন ইখানে কেনে, দেমাক লিয়ে মর গে যা, দূর হ।

ভর-মার চোখ ভাঁটার মতো জলছে, যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে। মাথা-ঘোরা বেড়ে গেছে। জটা জটা চুলের সাঁই সাঁই আওয়াজে কি রকম ভীষণ লাগছে। মতিঠাকরুণ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ভর-মার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে, দয়া কর মা, দয়া কর মা, দয়া কর মা, জীবনটা জ্বলি গেল, তখুন অবুঝ ছিলেম তাই গতর লিয়ে দম্ভ ছেল, এখুন ক্ষেমা দাও, একটো উপায় কর মা, আর সহ্যি হয় না। বলতে বলতে মতিঠাকরুণ কেঁদে ফেলে। ভিজে কাপড়ে, সিঁদুরে, মাটিতে লেপালেপি। ঠাকরুণের কান্না আর ভর-মার গঁ গঁ, বিড় বিড় শব্দ ছাড়া সব কেমন চুপ মেরে গেছে। সেই আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

রসিক এই সব দেখছিল। ভর ওঠা দেখেছে অনেকবার কিন্তু এমন দৃশ্য দেখে নি। ঠাকরুণ ব্যাকুল ভাবে আকুলি পাকুলি করছে। ভর-মার খেয়াল নেই। আপন মনেই মাথা ঘোরাচ্ছে, বিড় বিড় করছে।

এক সময় মাটি থাবড়ে বলে উঠল, হবে নি, হবে নি, ধর্না দিলি কি সব ফেরে, হুঁ কপাল নেখন মুছা শক্ত, উ হবার লয়, তুর ভাতার দি কিছু হবে নি, উয়ার সব গেছে, উ আর পুরুষ লয়, গাছবাখলের তুল্য।! ই পর-ভাতারের কাম, তুর লিয়তি, তা এক কাজ কর, থানের মাটি দি মাদুলি কর, জ্বালুনি লরম পড়বে, দিন কাটিবে।

মুহূর্তে ঠাকরুণের লুটিয়ে পড়া দেহটা সিধে হয়, ভিজে কাপড়ের আঁচল থেকে ক'গণ্ডা পয়সা গাছতলায় ছুড়ে দিয়ে, একটা প্রণাম করে উঠে পড়ে। গোটা মুখটা কেমন থমথম করছে। চোখের জলের রেখাগুলো শুকিয়ে সারা মুখময় কেমন দাগ ধরেছে। ও রসিককে কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রসিকও পিছুন পিছন বেরিয়ে আসে। সারা পথে ওদের আর তেমন কথা হয় নি। মতিঠাকরুণ কেমন যেন একটা ঘোরে হাঁটছিল। অনেক সময় রসিকই পিছিয়ে পড়ছিল।

গাঁয়ে ফিরতে ফিরতে অনেক বেলা হয়ে গেল। গাঁয়ের লোক হঠাৎ ওদের মাঠ ভেঙে ফিরতে দেখে অবাক হয়েছিল। ঠাকরুণের কোন দিকে খেয়াল নেই, হন হন করতে করতে খানা ডোবা বাঁশঝাড় পেরিয়ে একেবারে বাড়ির উঠানে এসে থেমেছিল।

রসিক যে জিনিসটা আশঙ্কা করেছিল তাই ঘটল। উঠানে খ্যাপা কুকুরের মতো সাধন মাঝি ছটফট করছিল। ওদের ঢুকতে দেখেই সোজা সামনে এসে দাঁড়াল।

মতিঠাকরুণ পাশ দিয়ে ঘরে উঠতে যেতেই মাঝি এক হাতে ওকে টেনে এনে বলল, কোতি গেল্‌ছিলি? রাগে মাঝির সমস্ত শরীর কাঁপছে।

ঠাকরুণ ঝাঁকি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে বলে, সি তুমার জেনে লাভ নাই।

লাভ নাই? মাগী, পর-ভাতারে মুন উঠেছে? আজ তুর একদিন কি আমার একদিন, বুল উ হাবড়ার সাথি কোতি গেলছিলি, কি আশের ল্যাগে গেলছিলি?

মতিঠাকরুণের শ্রান্ত শরীরটা পাকা বেতের মতো চিতিয়ে ওঠে। সাধন মাঝির মুখ সই সিধে দাঁড়ায়। চোখ দুটোয় হল্কা ছোটে। ও এক টানে বুকের কাপড় ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলে, কি কত্তে গেলছিলাম, জিজ্ঞেসছিলে না, জানতি

গেলছিলাম, ই সব তাগা তাবিজের গুণ কত? সি বিহার দিন থেকি তুমার বচন শুনচি, গতরে মাদুলি বেন্ধেচি, রেত বেরেতে যখুন বুক জ্বালুনিতে ককিয়ে মরচি তখুন তুমার ধম্মকতা শুনেছি, কিন্তু কি হল, বুল ই সব গা ভত্তি তাগা তাবিজে কি হল? মাগী বুলছিলে না, ছু তুমার মতু বাছপড়া বুড়াকে বিহা করার চে মাগী হওয়া ঢের ভালো ছেল। অত বুঝতে পারি নাই। আজ ভর-মা তলা থেকি নিশ্চিন্তি হলেম, তুমার উই গতরটুকুই আছে, সার নাই, ঘূণ ধরি শ্যাষ করি গেছে। উই শরীলে ধম্ম ধম্ম বুলা চলে, কম্ম করার ক্ষ্যামতা নাই। কি কত্তি গেলছিলেম, আর শুনতি চাও? বড় সুহাগ করি কোতি কোতি থেকি তাগা তাবিজ আনছিলে, লাও তুমার ক্ষ্যামতার কড়ি, অমুন সুহাগে ছাই পড়ুক।— বলতে বলতে মতিঠাকরুণ একে একে হাত, বুক, কোমর থেকে ঐ সব মাদুলি, তাবিজ, কড়ি, শিকড় ছিঁড়ে ছিড়ে সাধন মাঝির উদ্দেশ্যে ছুড়ে দিতে লাগল।

শেষে বুকের কাপড় সামলে বলল, কি আমার জুয়ান মরদ রে, বোয়ের খবরদারি করতি আসে! ইস্, আমার একদিন কি তুর একদিন, বুলতে জিভ খসল না? যে মিন্‌ষে ডাগর বোর জ্বালা মিটাতে পারে না, সি আবার উয়ার চরিত্তির খুঁট ধরে—কতি গেলছিলি,—যাই নাই গেলি ভালো ছেল, তুমার বুকে ককিয়ে মরার চে ভালো ছেল। সোয়ামি হইচে, ভাতার, আমার মরণ হয় না কেন? উই তাগা তাবিজের চে এট্টু ধুত্‌রোর বীজ আনি দিতি পারো না— এমুন দগ্ধে দগ্ধে মরার চে এক্কেবারে মরি বাঁচতাম। বলতে বলতে মতিঠাকরুণ কান্নায় ভেঙে পড়ে। ছিটকে ঘরের মধ্যে ঢুকে খিল লাগিয়ে দেয়।

রসিক হতবাক্ হয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকে।

সাধন মাঝির সেই রোষ, সেই দাপাদাপি মিইয়ে গেছে, কেমন আতুর, অসহায় লাগছে। চতুর্দিকে কড়ি, মাদুলি ছড়ানো ছিটানো। তার মাঝে সাধন মাঝিকে কী রকম নিঃস্ব রিক্ত দীন বলে মনে হচ্ছিল। ওর দিকে তাকিয়ে থাকা কঠিন। সহ্য হচ্ছিল না রসিকের। ও আস্তে আস্তে সাধন মাঝির সম্মুখ থেকে পালিয়ে গেল।

তারপর থেকে রসিক লক্ষ্য করেছে সাধন মাঝি কেমন পাল্টে গেছে। পূজো-আর্চা থেকে দিন রাত বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। কি অত পড়ে কে জানে। ধারে কাছে যেতে গা কাঁপে। কেমন থমথমে চোখ-মুখ। সন্ধ্যায় তালিমে এতটুকু ঢিল পড়ে নি বরং আরো জোরদার হয়েছে। লোক ডেকে আসর সাজিয়ে মাঝি বসে থাকে, রসিককে আসর চালাতে হয়। কখনো মাঝি

হঠাৎ কোমরে চাদর বেঁধে পাল্লা ধরে, হাতে তাল দিয়ে ছড়া কাটে, রসিককে উত্তর দিতে হয়। এই ভাবে জোর পাল্লা চলে। সন্ধ্যেটুকুতে মাঝি ভিন্ন মানুষ, গানের নেশায় ডুবু ডুবু, বস চড়িয়ে কথা বলে। তাই ঐ সময় রসিকের সাহস অনেক, বেশ মন খুলে কথা বলতে পারে। কিন্তু সকাল হলেই মাঝি অন্য মানুষ, মুখে এতটুকু হাসি নেই, সন্ধ্যের কোন কথা নেই, কেমন রস-কষহীন গম্ভীর মানুষ, মুখ গুঁজে পুঁথি পড়ে, অন্য দিকে নজর নেই।

মতিঠাকরুণ প্রথম ক'দিন গম্ভীর হলেও আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। আগের মতো না হলেও, ঠেকা দিয়ে, চোখ নাচিয়ে কথা বলে। চলনে বলনে সেই পুরানো চটক না থাকলেও চমক আছে। শরীর রেখে ঢেকে চলতেই পাবে না। তবে আগের মতো হাসি কমেছে, কথায় কথায় এখন আর হাসে না। হাসির কথায় কেমন থমকে যায়। কী ভাবে যেন। রসিক কতদিন লক্ষ্য করেছে, ঠাকরুণ দাওয়ায় বসে কী ভাবছে। জিজ্ঞেস করতে পারে না, বাজ্যের দ্বিধা, তবে বুঝতে পারে, ঠাকরুণেব কিছু একটা হয়েছে।

মতিঠাকরুণের পরিবর্তনটা খুব স্পষ্ট না হলেও নজর এড়ায় না। অন্য কারুর কাছে তার কোন অর্থ না থাকলেও, রসিকের কাছে সেটুকুই বড় চিন্তার হয়ে দাড়িয়েছিল। নিত্য দিনের ঘনিষ্ঠতায় মতিঠাকরুণেব বর্তমান অন্যমনস্কতা কি রকম বিসদৃশ মনে হচ্ছে। সেই পূর্বেকার উচ্ছলতা, চপলতা সবই আছে আর আছে বলেই ঐ সাময়িক অন্যমনস্কতা রসিকের চোখে বড় প্রকট হয়ে উঠছিল। কোথাও যেন কিছু হয়েছে। আপন উচ্ছ্বাসে হঠাৎ মেতে উঠে আর সবাইকে আবেগে ভাসিয়ে ঠাকরুণ এক সময় নিজের মধ্যে তলিয়ে যায়, কি এক ভাবনার মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে ফেলে, তখন আর ওকে চেনা যায় না।

কতদিন ঠাকরুণকে সাঁঝবেলায় একলা উঠোনে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে দেখেছে রসিক। তখন আর তার হুঁশ থাকে না। চেতন আছে কিনা বোঝা যায় না।

অমন নিমগ্নতায় ডাক দিতে সাহস হয় না। ভাব সমাধির কথা রসিক শুনেছে। পাগলাবাবাকে সমাধিস্থ হতে দেখেছে। সেই সময় ওঁর কাছে কাউকে ঘেঁষতে দেয় না। সকলের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা। মুখে মুখে রসিক শুনতে পায়, অমন সময় পাগলাবাবাকে ছুঁতে নেই—তাহলেই বাবা আর চোখ খুলবেন না, বাবার আর চেতন ফিরবে না, বাবা তাঁর ভাবরাজ্যে চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবেন। মতিঠাকরুণকে অমন ভাবে বিভোর হয়ে বসে থাকতে দেখে তাই

আশঙ্কা হয়, ডাকতে তাই সাহস হয় না। রসিক কাছেপিঠেই ঘুর ঘুর করে। কিন্তু মন মানে না, তাই শেষে এক সময় খুব ধীরে ধীরে ডাক দেয়, ঠাকরোণ, ঠাকরোণ! বার কয় ডাকার পরও যখন ঠাকরুণের সাড়া জাগে না তখন রসিক ভয় পেয়ে যায়। দারুণ এক কাতরতা নিয়ে মতিঠাকরুণের হাত ধরে নাড়া দেয়।

মতিঠাকরুণ যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠে। রসিককে অমন ব্যাগ্রতা নিয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে হেসে ফেলে, কী হল, দেখছ কি অমুন করে?

রসিক কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না, শেষে খুব আস্তে আস্তে বলে, ঠাক্‌রোণ, থেকি থেকি তুমার কি হয়, কেমুন নাড়ি ছাড়ি যাওয়ার মতু গতি, ভয়ে আমার হাত পা সেঁদিয়ে যায়। কি অত ভাবো কি?

ভাবব কি, এমনি কাজ-কাম নাই, চুপচাপ বসি থাকি।

না ঠাক্‌রোণ, অমুন উদাস ভাব তুমায় মানায় না, তুমি সি আগের মতু হাসবে খেলবে, খুনশুটি করবে, উয়াতেই তুমায় মানায়। তুমায় ভাবতি দেখলি কেমুন ভয় হয়।

রসিকের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা ফুটে উঠতে দেখে মতিঠাকরুণ একটু শব্দ করে হেসে ফেলে, ইস, আমার ভাবনায় দেখি তুমার ঘুম হচ্ছে না লাগছে, এত দরদ সইলে হয়। তারপর এক সময় হাসি থামিয়ে খুব ঘনিষ্ঠ স্বরে বলল, আচ্ছা, তুমার ব্যাপারখানা কি, বুলতো, বিহার জন্যি কুনো টান নাই লাগছে? ই কিন্তু ভালো লয়, সব কিছুর একটো সুময় আছে, যি সুময়ের যি কাজ, জমির জো-এর মতু, জো কাটলে আবাদে ফসল ফলে না। না, গো, বিহা করি লাও, ইই তো সুময়, যি ম্যাইয়ে আসবে উয়ারও তো একটো সাধ আহ্লাদ আছে, উয়ার তাতালো শরীল লিয়ে সোয়ামির পাসালো বুকে দাপাদাপি করার মতু তাড়া থাকে! তুমরা আর কতটি জানতি পারো, সব ম্যাইয়ার বুকে একটো জুয়ান মরদের জন্যি থাকৃতি আছে, যি উয়াকে লিয়ে দস্যিপানা করবে, উয়ার গতর লিয়ে ধাম্‌সা ধাম্‌সি করবে। ম্যাইয়াদের বুকের জ্বালা তুমরা কি বুঝবে বুল, উয়ার জানান নাই, ভিতরে ভিতরে মাথা কুটে মরে, বুলতে পারে না।

তারপর একটু থেমে দম নিয়ে বলেছিল, আজকাল বড্ড সিই সব পুরানো দিনের কথা মুনে পড়ে। আশে পাশের দু-পাঁচটা গাঁয়ে আমায় চিনত। বড্ড দামাল ছিলেম, বাগানে পুখোরঘাটে ঘুরি ঘুরি বেড়াতেম। বন্ধুরা আমায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখত, আমি অং মেখেছি কি না, এমুনি সোনাগলা অং ছেল। পথ চল্‌তি মানুষ থমকে থামত, কাছে ডেকে আদর করত, বাপ মায় নাম শুধাত।

পুজো-পালায় গাঁয়ে বাবুদের বাড়ি ঠাকুর, পুতুলনাচ কি পালাগান শুনতি যেতাম। বাবুর বাড়ির বৌরা ওনাদের ছ্যালে ম্যাইয়েদের ডাকি ডাকি বুলতেন, ছ্যাখ, তুরা কেমন ছিষ্টিছাড়া, ইয়ার অং দেখছিস্, চোখ মুখ নাক! বাবুদের বাড়ির ইস্কুলে পড়া ছোট ছেলেটি তো নিত্যি ঘুর ঘুর করত। আমি যখুন বুড়িবাড়ি কি সুন্দাবাড়ি খেলতি খেলতি হাঁপিয়ে উঠতেম, উয়ার চোখ মুখ কেমুন জ্বল জ্বল করত। একবার তো খেঁটে খেলতি খেলতি ছুট্‌ছি, ছড়া কাট্‌ছি,—খেঁটে খেলা খেলিয়ে/বাঘ মারি ঢেলিযে/ঢেলিয়ে ঢেলিয়ে ঢেলিযে...। হাতে ছেল একটো আধ খাওয়া প্যায়রা, ছুট্‌তি ছুট্‌তি হঠাৎ হাত থেকি ফস্‌কি বেচারির কপালে, ছেলেটা উঃ করি বসি পড়ল, তারপরই প্যায়রাটা দেখতি পেয়ে আমার দিকে তাকায়ে হেসে ফেলল। সিদিন কি নজ্জাই না ল্যাগেছেল! আর খেলতি পারি নাই, পালায়ে এইছিলেম।

সিই খেঁটে খেলার বয়স থেকিই লিজের চেহারা দেখি কেমুন আড়া হতেম, পুখোরে তুলপাড় করি সাঁতার দিতেম, ছুঁড়াগুলানের ছুঁক ছুঁক বাই দেখি মজা লাগত। লিজের কদর বুঝতি শিখ্যাছিলেম তাই গবব্ব ছেল, দেমাগ ছেল, কুনো কিছুতে মুন উঠত না। তা কপাল ছ্যাখ, আমার বিহা হল, এক বুড়ো হাবড়া মিনষের সাথে, যার তিন কাল যে এককালে ঠেকেছে। ইয়াকে বিহা বুলে না পুষ্যি লেওয়া বুলে, বুড়ো যেন ভিন কাউরোর জন্যি আমাকে পাল্‌ছে। বুড়োর দরদ আছে, টান আছে, বোর সখটা আশটা মিটবার ল্যাগে হন্যে হই বেড়ায়, কিন্তুক ইয়াতে জ্বালুনি থামে না, ইয়াকে সুহাগ বুলে না, ইযাতে ডাগর ম্যাইয়ার খাই মেটে না। উই যি বলমু, জুয়ান ম্যাইয়ের ল্যাগে তাগড়া মরদ দরকার, দাপাদাপি, দস্যিপনা কইর‍্যা সুখ, ইয়া উই বুড়ো হাবড়ার কাম লয়। উয়ার আদরে বুক কুমোর মুচড় দি উঠে না, কেমুন যেন বাপম্যাইয়েব দরদ মুনে হয়, বাপ যেমুন ডর-লাগা ম্যাইয়েকে জড়ায়ে ধরে, মাঝির অমুন পারা পীরিত। মাঝির উয়াতেই সুখ কিন্তু ডাগর বো'টার সুখ উয়াতে মিটে না, উয়ার বুক জ্বলি জ্বলি খাক হই গেল। ইয়াতেই তো ঘরের বো বারপুরুষ খোঁজে, বারপুরুষের কাছে আনচান বুকটার তিষ্টে মিটায়, লয়তো গলায় কাপুড় বেন্ধে লটকে পড়ে, কি কলস বেন্ধে বিলে তলিয়ে যায়। তাই বুলি, সুময় থাকতি ব্যবুস্থা কর, তাগদ থাকতি থাকতি ডাগর বো লিয়ে এস। উয়াতে দুজনার সুখ, দুজনার খাই মিটে।

সাঁঝবেলায় যতিঠাকরুণের দূরমনস্কতার মধ্যে নানান্ কথায় কথায় রসিক আর এক ঠাকরুণকে চিনল, যার মধ্যে যুক্তি আছে, বিবেচনা আছে, যার নিজের

অতীত স্মৃতিটা তেমনি রঙিন হয়ে মনের মধ্যে যাওয়া আসা করে। তবে কি মতিঠাকরুণ নিজের হারানো জীবনটার কথায় মশগুল হয়ে থাকে, তাই কি অমন আনমনা, না বিমনার ভিন্ন কিছু অর্থ আছে?

রসিক কিছু বলতে পারে না, ঠাকরুণের কথা ভাবতে ভাবতে কি রকম ব্যাকুল হয়ে পড়ে।

অনেকক্ষণ চুপ থেকে এক সময় বড বিষাদ নিয়ে মতিঠাকরুণ বলে, আচ্ছা বুল তো, ইই যি আমার কথার কুনো আখ ঢাক নাই, ব্যভারে লাজনজ্জা নাই, তুমায় লিজের সুখ সাধের কথা, ম্যাইয়াদের ভিতরের কথা বুলে দিই, ই সব তুমার ভাল্লাগে না, না? আমায় খুব খারাপ বুলে মুনে হয়, না? ঘ্যাখ, সক্কলকে তো সব কিছু বুলা যায় না, বুঝার মতু মুনও সক্কলের থাকে না। যি কথা একজনা দরদ দি বুঝে, সি কথা অন্যজনা উদ্দেশ লিয়ে বুঝে। তুমি কি বুঝ জানি না, কিন্তু বিশ্বেস কর, তুমায় বুলতে ভাল্লাগে তাই বুলি, তুমি আঁত্তার কথাটো বুঝবে বুলে মুন চায়। তবে ই কথা ঠিক, মুনের মধ্যে পাপ নাই বুলব না। তুমায় ঘ্যাখার পর বুকের জ্বালুনি বেড়েছে, কদ্দিন ভররেতে ঘুম ভেঙে তুমার ভাবনায় সুয্যি উঠে গেছে, তুমাব সঙ্গি মস্করা করি, ফক্কুড়ি মারি, সুখ হয়। ই সব কি পাপ? হয়তো তাই, কিন্তু মুন যি মানে না। এক এক সুময় ভাবি, যিদ্দিক চোখ যায় চলি যাই, কিংবা গলায় দড়ি দি, কিন্তু কিছুই হবার লয়, এমুনি ঘষড়ে ঘষড়েই মরতি হবে। কথার মাঝেই একটা নিশ্বাস চেপে ঠাকরুণ চুপ করে যায়।

ঠাকরুণের কথা শুনতে শুনতে রসিক খুব চঞ্চল হয়ে পডছিল, ভেতরে ভেতরে খুব উদ্বেল হয়ে উঠছিল। ঠাকরুণের সুখ সাধের কথায় বুকটা মোচড দিয়ে উঠছিল। ওরও যেন বলতে ইচ্ছে করছিল, ঠাকরোণ, তুমি যা কইলে, উ আমারও কথা, তুমায় দেখলি পরে বুকে সুখ কলকলায়, তুমার হাসি ঠাট্টায় মুনটো ভরে ওঠে, তুমার বেদন দুখে মুনে কাঁদন ঝরে। ঠাক্‌রোণ, ই সব কথা তো বুলতে নাই, তুমি মাঝিবৌ, সম্পক্কে গুরু যি, কিন্তু ভাবটো তো মিথ্যে লয়! তাই ঢেদ্দিন আমারও ঘুম ভাঙি যায়, তুমাব ভাবনায় রাত জেগে সুখ পাই। তুমায় কি বুলব, আমার বুকেও একটো রাত জাগা ডাক পাখি আছে, মেকি থেকি কুক দেয়, অক্তে ছলছলাৎ শব্দ ওঠে, বুক জ্বলুনি থামতি চায় না।

কিন্তু রসিক কিছুই বলতে পারে না। ঠাকরুণ সেই যে চুপ করেছে তারপর আর কোন সাড়া নেই। যেন নিজের মধ্যে সেঁদিয়ে গেছে। ঠাকরুণের অমন

বিষাদময় চেহারা দেখে রসিক স্থির থাকতে পারে না। বুকটা গুরগুর করে ওঠে। সেই অনন্ত নৈঃশব্দের মধ্যে অবিরাম ঝিঁ ঝিঁ ধ্বনি জাগা সন্ধ্যায় রসিক কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ঠাকরুণকে সান্ত্বনা কি সহানুভূতি কিছুই জানাতে পারে না, পারলে হয়তো ভালো হত, বুকটা হাল্কা হত। সে আর অমন ভাবে অসহায়ের মতো বসে থাকতে পারে না, নিজেকেও কেমন যেন অসহ্য মনে হয়। রসিক নিঃশব্দে উঠে আসে।

দিনে দিনে রসিকের কাছে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, ওর পক্ষে আর নিজেকে রক্ষা করা হয়তো এরপর শক্ত হবে। মতিঠাকরুণের জন্যে একটা বেদনাবোধ জাগছিল। তার কথায় ওর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠত, বুকের কোথাও একটা চিনেচিনে ব্যথা শুরু হত। ও বুঝতে পারছিল, ওর আর এখানে থাকা হবে না। কবে হয়তো সে গুরুর সঙ্গে বেইমানি করে ফেলবে।

কিন্তু তার চলে যাওয়াটা যে এত আকস্মিক ভাবে, এত তাড়াতাড়ি হবে, তা সে কল্পনাও করতে পারেনি।

ক'দিন ধরেই খুব তোড়জোড় চলছে। সাধন মাঝি আবার বহুদিন পরে বায়না নিয়েছে। আর রসিক আনন্দে ছটফটিয়ে উঠল যখন সাধন মাঝি বলল, এবারকার গান ওকেই চালাতে হবে। সাধন মাঝির দলে ও-ই এবার থেকে মাস্টার।

সেদিন আর ও কোথা বেরোয় নি। ঘরে শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল সব ভেবেছে। গান শেষ করে ও ক'দিনের জন্যে মনোহরপুরে যাবে। সেখানে ওর বুড়ো বাপের কি যে হল, এতদিন বেঁচে আছে কি না কে জানে। ছেলেকে দেখে বাপ নিশ্চয় সুখী হবে। সেই আগের দিনের কত কথা তার মনে পড়ছিল। বাপকে বলতে পারবে, সেই তখন আঁক কষতে শিখেছিল বলেই আজ সাধন মাঝির দলে সে মাস্টার।

ঐ আঁক কষা নিয়ে কত কাজিয়া, ঝগড়া। ও কিন্তু ও সব কথায় কান দিত না। বাপ বসে বসে গালমন্দ করত। শেষে একদিন কথা কাটাকাটি হতে হতে চরমে দাঁড়াল। বাপ ছুটে এসে এক আছাড়ে ওর স্লেটটা ভেঙে দিল

আর ও সেই আঘাতে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। শেষে পায়ে পায়ে দাওয়া থেকে নেমে, রাজবংশীদের পাড়া ঘুরে দে বাবুর খোলেনবাড়ি ছাড়িয়ে বিলকালীর থানে গিয়ে থেমেছিল। কি ভেবে সেখানে একটা প্রণাম করে কলকলির ধার ধরে হাঁটতে শুরু করেছিল।

তারপর কত জায়গায় ঘুরল, কত মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় হল, শেষে সাত ঘাট ঘুরতে ঘুরতে সাধন মাঝির ভিটেয় এসে ভিড়ল। হয়তো এবার তার চলার শেষ হল।

এই সব নানান্ কথা ভাবতে ভাবতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। একটা অস্বস্তিতে তার সেই তন্দ্রাভাব কেটে গেল। তার শরীরটা যেন পুড়ে যাচ্ছে। বুকের ওপর ভারটা যেন ক্রমেই বাড়ছিল আর তার ঠোঁট দুটো কিসের চাপে পিষে জ্বালা করতে শুরু করেছিল।

তখন বাইরে আঁধার নেমেছে। সেই আবছা আলোয় সে বুঝতে পারল মতিঠাকরুণের হাত-পা শরীরের বাঁধনে ও কেমন যেন অসাড় হয়ে পড়েছে। অনুভব করল, তার কাপড়ের ফাঁস আলগা হয়ে গেছে। মতিঠাকরুণের দেহ তার শরীরে লেপটে রয়েছে। তার শরীরের ভাঁজে ভাঁজে তীব্র জ্বালা। সে অনুভব করল মতিঠাকরুণের শরীরের কোথাও এতটুকু আবরণ নেই।

ও ক্রমেই বেহুঁশ হয়ে পড়ছিল। নিজের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিল। একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় রসিক ছটফটিয়ে উঠল। ওর শরীরের সর্বত্র একটা উত্তপ্ত রক্তস্রোত বয়ে চলেছে। গুরুর সঙ্গে বেইমানি—ও ছিট্‌কে মতিঠাকরুণের বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়।

মতিঠাকরুণ তার পাশে শুয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছিল। শেষে রাগে ফুলতে ফুলতে উঠে বসে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নখ দিয়ে বুক আঁচড়ে কামড়ে বলতে লাগল, পুরুষ হয়েছে, ভড়ং, সাধু পুরুষ! তারপরেই আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে রসিকের তলপেটে প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি মেরে ঘর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল।

অমন তীব্র আঘাতটা রসিকের পক্ষেও সহ্য হয়নি। ও আস্তে আস্তে জ্ঞান হারিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল।

এই ভাবে কতক্ষণ পড়ে ছিল খেয়াল নেই। চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা লাগতে ওর চেতনা ফিরে এলো। বুকে কে যেন ঠাণ্ডা জল-হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, মাথায় হাওয়া করছে।

চোখ মেলে তাকিয়ে অবাক হল রসিক, মতিঠাকরুণের চেহারাটা ধোঁয়ার মধ্যে থেকে স্পষ্ট হল। ওর চোখের জল রসিকের কপালে এসে পড়ল। মতিঠাকরুণ লালপাড় শাড়ি পরে ওর মাথাটা কোলে নিয়ে বুকে ঠাণ্ডা জলহাত বুলিয়ে দিচ্ছে, বাতাস করছে।

রসিকের আস্তে আস্তে সব মনে পড়ল। সে চমকে নিজের পরনের দিকে তাকিয়ে দেখল, ও আগের মতোই কাপড় পরে আছে। তবে কি সে স্বপ্ন দেখছিল। ওই ঘোর ঘোর অবস্থার মধ্যে মতিঠাকরুণের কোলে শুয়ে ও এক অসীম শান্তি পাচ্ছিল। মতিঠাকরুণের কান্না দেখে ওর বুকে এক তীব্র হাহাকার শুরু হয়েছিল।

তারপর ক'দিন বেশ স্বাভাবিক ভাবে কেটে গেল। তলপেটের ব্যথাটা প্রথম প্রথম অসহ্য হলেও আস্তে আস্তে কমে এলো। ও নিজেকে আবার সেই গানের জন্যে ব্যস্ত করে তুলল।

এর মধ্যে বেশ কয়েকবার মতিঠাকরুণের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। বেশ সহজ ভাবে হেসে আগের মতো কথা বলেছে, এটা ওটা এগিয়ে দিয়েছে। সেদিনের ঘটনার জন্যে কারুর মনেই আর কোন অস্বস্তি ছিল না।

দেখতে দেখতে গানের দিন এসে গেল। আগামীকাল ভোরে ওরা যাত্রা করবে। গরুর গাড়িতে লাভপুর স্টেশন, সেখান থেকে বোলপুরে। ওখানের পৌষ মেলায় গান হবে।

পৌষ মাসে হয় তাই পৌষ মেলা, আসলে ভুবনডাঙ্গার মেলা। বড় জবর মেলা। দেহাতি মানুষের ভিড়। আশপাশের খরা ডাঙ্গার মানুষ সব ভিড় করে। কোন্ কোন্ গাঁ থেকে গো-গাড়িতে মানুষ আসে, আসে সম্বৎসরের এটা সেটা। ধামা কুলো থেকে সৌখিন শাড়ি কাপড় পর্যন্ত। বন বাদাড়, জঙ্গল মহল থেকে সাঁওতালরা দল বেঁধে আসে। খোঁপায় টকটকে পলাশ, শিমুল তোড়া, পরনে ফিকে সবুজ, ঘন নীল দোফেত্তা কাপড়। হাত ধরাধরি করে যখন পথ চলে, তাকিয়ে থাকার মতো, আর কাঁচের চুড়ি, রঙিন ফিতে, বাহারে কাঁকুই কিনতে যখন জড়ো হয়, তাক্ লেগে যাবার মতো ওদের হুল্লোড়। দোকানী

নিটোল হাত ধরে আয়েস করে চুড়ি পরায় কখনো চুট্কি ফক্কুড়ি করে আর সেই লতানো দেহাতি শরীর হাসিতে ভেঙে ভেঙে পড়ে। আর যখন মেলা শেষে ঘর ফিরতি মুখে ওবা কোমর জড়িয়ে মাদলের তালে তালে গান ধরে, নাচ করে—চারিদিকে লোক জমে যায়। তাদের তালে তালে কোমর বুক, নিতম্বের আলোড়ন, মানুষ তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করে।

কবি, তর্জা, বাউল—এই সবের সঙ্গে সাঁওতালি নাচ, দেহাতি শরীর মিশে আছে বলেই ভুবনডাঙ্গার অত নাম ডাক। সওদা কেনা বেচার ফাঁকে ঐসব মিনি পয়সার সুখ মানুষকে ধরে রাখে। তাই ও মেলায় জবর ভিড। শহুরে মানুষের ভিড়। উট্কো, বুঝদার সব রকম মানুষের ভিড়। ওখানে গান গেয়ে নাম করতে পারলে তার কদর আলাদা।

ফি বছর সাধন মাঝির বায়না বাঁধা। কোন বছর কেউ বলতে পারবে না, মাঝির গান তেমুন জমল না। বছর বছর মাঝি টাকার সঙ্গে খাতির এনে তুলেছে। এবার রসিকের পালা। রসিকের তাই চিন্তাও অনেক।

সেদিন সন্ধ্যায় দাওয়ায় বসে রসিক মেলার কথাই ভাবছিল। চতুর্দিকে লোক গিজ গিজ করছে। হিস্ হিস্ করে হ্যাজাক, ডেলাইটে আসর আলোয় আলোময়। মাঝে রসিক, তাকে ঘিরে ছড়িদার, দোহার, বাজিয়ে, ছোকরা নাচিয়েরা। পাকা গাইয়ের মতো রসিক হাত জড়ো করে আরাধনা সারে, ভাবে গদ গদ হয়ে ছড়া কাটে—

> কে রে শতদল পরে শ্বেতবরণী
>
> মম কণ্ঠে বিরাজ করো বাগবাদিনী।
>
> পড়িয়ে কাতরে ডাকি মা তোমারে
>
> এস এই আসরে, হর মনমোহিনী।
>
> বীণা যন্ত্রে ধরা, রূপে মনোহরা
>
> বাজে সপ্ত সুরে কত রাগরাগিণী।

কোন বাজনা নেই, খোল না, ঢোলক না, ডুব্কি না, শুধু টিনি নিনি করে কাঁসর বাজবে। তারপর তাল ফিরিয়ে গান ধরবে। বাহ্বা, বাহ্বা করে উঠবে লোকজন, মেতে উঠবে আসর, সবাই বলবে, হ, সাধন মাঝির জুটি বটে, মাঝি শিখাইছিল বটে। গানের শেষে টাকার সঙ্গে খাতির।

ঘরে ফিরে মাঝি বুকে জড়িয়ে বলবে, হুঁ, তু আমার মান রাখলি, আমার কত্তালি মাঠে মারা যায় নাই, তু লিয়েছিস বটে। শুনতে শুনতে রসিকের বুকটা

ভরে উঠবে, পায়ের ধূলো নিতে নিতে বলবে—ই আর এমুন কি, তুমার ল্যায় গুরু জুটলে অমুন সব্বাই হতি পারে, তুমার দয়ায়, দেখবা, সব আসর ঠিক মাৎ করি আসব। কার চ্যালা দেখতি হবে!

তার অমন ক্যাদ্দানি দেখে মতিঠাকরুণ কি বলবে? ঠাকরুণের নামে রসিকের বুকে কেমন খুশি জমে। ঠাকরুণ ঠিক গালে হাত দিয়ে চোখ বড় বড় করে বলবে, হাই গো, তুমি মানুষটো এত নাম করলে, আসরের কি একটা লোকও গান বুঝতো না, সব্বাই কি হেঁদিপেঁচি! তারপর হয়তো চোখ নামিয়ে বলবে, হ্যা গো, আসরে কেমুন ম্যাইয়েলোক জুটেছিল, ডাগর ডাগর কচি, কচি? উয়ারা শুইনে কী বুলল?

রসিক উত্তর দেবে না। মিটি মিটি করে হাসবে। ঠাকরুণ শেষে বিরক্ত হয়ে মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠবে, বুলবে আর কি, ছাই বুলবে। বুলবে, উই মানুষটো পুরুষ না ম্যাইয়ে; অমুন দশাসই শরীল লিয়ে ল্যাকা ল্যাকা গান গায়? তারপর ধুপধাপ পা ফেলে ঘরে উঠে যাবে।

রসিক সেদিন সন্ধ্যায় দাওয়ায় বসে এই সব ভাবছিল আর মনে মনে হাসছিল। হঠাৎ পাশে মতিঠাকরুণকে ধুপ করে বসে পড়তে দেখে চমকে উঠেছিল। ও কিছু বলার আগেই ঠাকরুণ বলে উঠল, কী অত ভাবছ কি, আসরের কথা? আসর তুমার মাৎ হবেই, দেখবা কেমুন খাতির পাও। তুমার মতু ছিষ্টিছাড়া মানুষের আখের ঠিক থাকে। আর মাঝির জুটি তুমি, উই ভারেই কেটে যাবে। তা মেলা থেকি আমার জন্যি কি আনবা, মাঝির মতু আমিও তো তুমার মান্যজন, তা কী আনবা, বুল?

ঠাকরুণের কথা শুনে রসিক খুশি হয়, বেশ মেজাজ নিয়ে বলে, কি আনব বুল, রঙিন চুড়ি, ঝুমকো কাঁটা, পাথর বসা নথ, বাহারি মানতাসা, বাস তেল—বুল তো গোটা মেলাটাই তুলে লিয়ে আসব।

ঠাকরুণ থামিয়ে বলে, থাক্ থাক্, ঢের হইচে, বড় দরদ, তুমার বউ হলি গোটা মেলা উয়াকে দিও, আমার সহ্যি হবে না। তার চে, একটো কাঠের সিঁদুর ডিবা আর দু' গাছা লাল পলার চুড়ি, এয়োতির সব্বস্ব, আনি দিতে পারো বুঝব, না, ঠাকরুণের জন্যি তুমার টান আছে। কি—পারবা না? না পারো তো এক গাছা দড়ি আর কলস আনি দিও, উয়াতেও এয়োতির দুঃখ ঘোচে।

তারপর খিল খিল করে হেসে বলে ওঠে, কি গো, বড় বিপাকে পড়ি গেলে, ভাবচ, ঠাকরোণের এ আবার কেমন ধারা কথা! তুমিও যেমুন—না গো, কিছু

আনতি হবে না, যখুন খুউব নাম হবে, এক ডাকে সব্বাই চিনবে তখুন এই পুড়াকপালি মতিঠাকরোণকে ভুলি যেও না, তাহলিই হবে। তা তুমাকে যা জ্বালায়েচি, ভুমি ভুলতি পারবা না, মুনে মুনে যতুই দুষো, ঠাক্‌রোণ তুমার মুনে গাঁথি গেল, কি বুল? তারপর ওর হাতটা নিজের মুঠোয় নিয়ে বলেছিল, চল, তাড়াতাড়ি খায়ি লাও, রেতে ভালো ঘুম হওয়া চাই, দিন ভোর যেতি লাগবে, আর মেলায় বিরাম মেলা শক্ত, উঠ।

রসিক আর দেরী করে নি। কি রকম এক স্বস্তিতে বুক ভরে যায়। ও উঠে পড়ে। খাওয়ার পাট চুকলে মতিঠাকরুণও ছুটি পায়। তাই তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে নিজের ঘরে এসে শুয়েছিল। ঘরে ঢোকার মুখে মাঝিকে লক্ষ্য পড়েছিল। সাধন মাঝি কেমন গম্ভীর হয়ে আছে।

মাঝির শরীরটাও ক'দিন থেকে ভালো যাচ্ছে না। পুবপাড়ার আড্ডায় ও আজ যায় নি। সেই বিকেল থেকেই কেমন বেহুঁশের মতো বাঁশ ঝাড় জলা-জঙ্গলার দিকে তাকিয়ে আছে। এখন সন্ধ্যে, সেই বনবাদাড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি জ্বলছে নিভছে। তাকিয়ে তাকিয়ে চোখে ধাঁধা লেগে যায়। উঠোন পেরোতে পেরোতে রসিক সেদিকে মুখ ফিরিয়েছিল, মাঝি কি অমন দেখছে!

মাঝির ক'দিনের অন্যমনস্কতা দেখে রসিক ভেবেছিল, মাঝি তার ওপর হয়তো আস্থা রাখতে পারছে না। মাঝিকে কিছুটা সাহস দেবার জন্যই রসিক মাঝে মধ্যে কথা পেড়েছিল, কেপের মধ্যে বাগানবাড়িতে মালি-গৃহিণী কেচ্ছা কি শহরবাবু-ঠিকেঝির ব্যাপার নিয়ে কেমন পালা জমবে সে সব নিয়ে কিছু আলোচনা শুরু করেছিল।

মাঝি একটু আধটু ধরে দেওয়া ছাড়া খুব চাড় দেখায় নি। পরে অনেক আগ্রহ নিয়ে রসিক তার নতুন পদ শুনিয়ে ছিল—

ই দেশের ব্যাপারখানা
বুলতে হয় লাজ
মেয়েমানুষে মরদ সেজে
হচ্ছে ধড়িবাজ।
চুল ছেঁটেছে, শাড়ি ছেড়েছে
ছুটছে তাড়িঘড়ি
বাচ্চা কাঁধে খুন্তি নেড়ে
মরদ রাঁধে চচ্চড়ি।

কাঁধ কপালে চুলের গোছা
লায়েক জুয়ান ছোঁড়া
অঙ মেখে আর অঙিন জামায়
মেয়েমানষের বাড়া।
মেয়েদের পাল্লা জবর
কথায় ওরা সেরা
দেশটা ভাই পাল্টে গেল
সব পুরুষ আজ ভেড়া।

নতুন বাঁধা ছড়, রসিক বেশ মন দিয়ে গেয়েছিল। গানের শেষে মাঝি মুখ ফুটে শুধু বলেছিল, বেশ হয়েছে, তারপর সেই যে চুপ করেছে আর কোন সাড়া-শব্দ নেই, রসিক আর বসে থাকতে পারে নি, উঠে এসেছিল।

মাঝিকে অন্ধকারের দিকে অমন ভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে রসিক তাই কিছু বলতে পারে নি। নিঃশব্দে উঠে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর সাধন মাঝি রসিকের ঘরে এলো। দরজা বন্ধ করে তাকে অনেক কথা বলল, শেষে দক্ষিণা চাইল।

মাঝির প্রস্তাব শুনে আঁতকে উঠেছিল রসিক। থর থর করে ওর সারা শরীর কাঁপছিল। ও কেঁদে সাধন মাঝির পা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, কত্তা, অমুন হুকুমটা করো না, ই যে শুনাও পাপ।

সাধন মাঝির ষাট বছরের পল্‌কা শরীরটা পাকা বেতের মতো চিতিয়ে উঠেছিল, চোখ দুটো ভাটার মত জ্বলছিল। ও ধমক দিয়ে বলল, কি বুললি, পাপ! শ্যাষে তু বেইমানি করতে চাস্, গুরুর শাঁপার কথা খিয়াল নাই?

তারপর আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়ল। মিনতি করার ভঙ্গীতে বলল, তু একটুকুন ভেবে দেখ, গুরু বলি তো স্বীকার করছিস, কিরাা করছিলিস। আর পাপ তু কাবে কইছিস? তুর শরীলটা তো আমায় উচ্ছুগ্যু করে দিইছিস। তু কেনে ভাবছিস, শরীলটা তুর? তাহলি তুর গুরুর পতি লিষ্টা নাই?

আমার কথা না ভাবিস তো উয়ার কথাটো একটুকুন ভাব, উ কি লিয়ে বাঁচবে? অমুন বয়স, অমুন গা-জল লাগা যৈবন, উয়ারও তো সাধ আহ্লাদ আছে? রসিক, আমি কারোই হাত ধরে শিখাই নাই। তুর 'পরে উয়ার বড় মায়া। উই একটা আশা লয়ে তুকে শিখাইছি। যদি একটা ছ্যালে পেয়ে বো'র বুক জুড়ায়। তা তু শ্যাষে গুরুর সাথি বেইমানি করবি?

তু বিশ্বেস কর, ই কামটা পাপ লয়। ই জীবনে শাস্ত্রপুরাণ তো কম পড়লেম না। ই ক'দিন ঢের ঘাঁটছি, শাস্ত্রে অনেক দেষ্টান্ত আছে। উই যে কুরু-পাণ্ডবের পিতে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, উয়ারা কার সন্তান? পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রের পিতে বিচিত্রবীর্য, কিন্তু উয়াদের জম্মের আগেই তো পিতে মারা গেল। তখন ব্যাসদেবের ওরসে উয়াদের জম্ম হয়, আর কি জানিস, বিচিত্রবীর্যের মা সত্যবতী, উনিই ই কামটা করাইছিলেন। তবেই বুল, ই কামটা পাপ কি না? রসিক, আমার কথাটো রাখ, ইতে তুর কুনো পাপ হবে না, তুর বরং গুরুসেবার পুণ্যি হবে। গুরুবংশ রক্ষার দায় কাটবে।

সাধন মাঝির কথা শুনতে শুনতে রসিকের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল। একদিকে গুরুর বাক্য অন্যদিকে ধর্মের ভয়, কি করি কি করি ভাব। ভাবল, এ শরীরটা তো আমার নয়, গুরুকে উৎসর্গ করেছি, গুরু এ শরীর নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। মতিঠাকরুণের কান্নাও তার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছিল, শেষে সম্মতি দিল, কত্তা, তুমার বংশের ল্যাগে, মতিঠাকরুণের সাধের ল্যাগে, গুরুবাক্যির ল্যাগে তুমার কথা মানলেম। ইতে পাপ হয় তো হোক।

সাধন মাঝি ক'টা ফুল, গঙ্গাজল নিয়ে এলো। নবদা মন্ত্রে আর গঙ্গাজল, ফুলে রসিকের শরীরের নয়দ্বার শুদ্ধ করে নিল। তারপর ওর হাত ধরে পাশের ঘরে এলো।

সে ঘর থেকে তখন ধূপধুনোর গন্ধ বেরুচ্ছে। ঘরের মেঝেয় ফুল ছড়িয়ে বিছানা পাতা হয়েছে। ধপধপে চাদর বালিশ, তার ওপর আকাশী রঙের ঝিলমিলে শাড়ি পরে মতিঠাকরুণ শুয়ে আছে, হয়তো ঘুমোচ্ছে। পাশ ফিরে থাকা শরীরটা কী শান্ত, কী সুন্দর লাগছিল। ঠোঁটের কোণে একটুকরো হাসি জ্বলজ্বল করছে।

সাধন মাঝি বারকয় 'বউ বউ' বলে ডাকল, কোন সাড়া নেই। শেষে হাত দিয়ে ডাকতে গিয়ে চমকে উঠল। তার হাতের ধাক্কায় মতিঠাকরুণের মুখ দিয়ে একদলা রক্ত বেরিয়ে এলো। রসিক চিৎকার করে উঠেছিল, কিন্তু সাধন মাঝি ফিস ফিস করে ওকে থামাতে বলল বউ ঘুমাচ্ছে রে, উকে ঘুমাতে দে, উ ঘুমাক।

রসিকের আর সহ্য হয়নি, ঘর থেকে ও পালিয়ে এসেছিল।

ওর বুকে পাথর চাপা যন্ত্রণা, ঠাকরুণ বলেছিল, মেলা ফিরতি লাল পলার দু'গাছা চুড়ি আর বাহারে সিঁদুর ডিবা আনতে, এয়োতির সব্বস্ব নিয়ে ঠাকরুণ দিন কাটাবে, উয়াকে ভুলা ভার, পদে পদে সেই সব স্মৃতি, ঠাকরোণ এয়োতির সব্বস্ব নিয়ে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, চোখ বুজলেই সেই দৃশ্য, ঘোমটা কপালে জ্বল জ্বলে সিঁদুর, হাতে লাল পলার ঝিলিক। ঘুমন্ত শরীর জুড়ে সেই স্মৃতি প্রতি মুহূর্তে রসিককে তাড়া করে ফিরছে, এই যন্ত্রণা থেকে রসিকের নিষ্কৃতি নেই।

ওখানে রসিকের আর একটুও থাকতে ইচ্ছে করছিল না। সারা বাড়ি জুড়ে ঠাকরুণের অস্তিত্ব, পদে পদে তার সেই গা-জ্বল করা হাসি, অনায়াস রসিকতা, গা-গতরের ঠমক আর কথায় কথায় ধিক্কার, আক্ষেপ। এই বাড়ি, ঘর, দাওয়া, উঠান—সব ছেড়ে অন্য কোথাও না পালাতে পারলে ও পাগল হয়ে যাবে।

কিন্তু মাঝিকে ফেলে রেখে যায় কোন্ মুখে? মানুষটা কি রকম ঝিম মেরে গেছে। পুজোআচ্চা সব মাথায় উঠেছে। সব সময় ঠাকরুণের ঘরে বসে এটা নাড়ে, সেটা নাড়ে, এটা গোছায় সেটা গোছায়। খাওয়ার কোন ঠিক নেই, শোওয়ার কোন ঠিক নেই।

রসিক নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ঠাকরুণের ঘাট, শ্রাদ্ধব কাজ শেষ করল। ঐ বুড়ো বয়সে মাঝি কি নিষ্ঠাব সঙ্গে মুখে আগুন দিল, অন্য সব আচার পালন করল। তারপর থেকে নিজেকে কেমন গুটিযে নিল। বসিকেব সঙ্গে কোন কথা নেই, বাইরের লোকের সঙ্গে কোন আলাপ নেই, ওর জগতে ও ছাড়া আর সবাই যেন মুছে গেছে।

রসিকও তারপব থেকে পালাই পালাই কবছিল কিন্তু মানুষটাকে কিছু বলতে পারছিল না। অথচ গুমবে গুমবে মবা, নিয়ত ঠাকরুণের ঠেশ, ঠমক, ধিক্কারে পাগল হযে ওঠা। প্রতি মুহূর্ত ওব বড যন্ত্রণায় কাটছিল। শেষে মাঝিই ওকে একদিন মুক্তি দিল।

দিনকর্ম পব সন্ধ্যায় মাঝি ওব ঘবে এসে আসল কথা পাড়ল, রসিক, তু আর ইখানে পডে থেকি কি করবি, আমাব ই ভিটা ছাড়ি কুথাও যাবাব জো নাই, তু তো গান শিখেছিস, ইবার লিজেব পথ কবি লে, তুব আর কুনো গুরুদায় বইল না।

রসিক একবাব অস্পষ্ট স্বরে বলতে চেযেছিল, বত্ত, তুমি আব ইখানে পড়ি থেকি কি কববে, তুমি আমাব সাথি চল, তুমায় মাথোয কবি রাখব।

মাঝি ম্লান হেসেছিল, না রে, উ হওয়াব লয়, আমি গেলে, ঠাকরোণের বড সাধের ঘর দোব কে আগলাবে? তু তো জানিস না, ঠাকবোণ এর আশ পাশেই ঘুর ঘুব করে, উয়ার চলন বলন, হাসি মস্করা আমি সব শুনতে পাই। উ ভিটের টানে পডি বইল আর আমি ভিটে ছাডি চলি যাব? না রে, উ হয় না। ঠাকরোণের বড মায়া তুর উপব, তুর নিষ্ঠা আমায় টানে। তু চলি যা, তুর ভালো হলি আমাদের সুখ, তু লিজের পথ করি নে।

মাঝির কথা শুনতে শুনতে রসিক কেমন হয়ে যাচ্ছিল, মানুষটার বুকে এত জ্বালা, এত দরদ—মানুষটাকে বাইরে থেকেই সে দেখেছে, ভেতরটা আড়ালেই থেকে গেছে। নিজের পথ করার দিকে অত মাথাব্যথা নেই, জায়গাটাই সহ্য হচ্ছিল না রসিকের। ঠাকরুণ এমন ভাবে গোটা জায়গাটা ভরে রেখেছে, এক মুহূর্তের জন্যও ভোলা শক্ত। তার ওপর মাঝিব ঐ রকম গুটিয়ে নেওয়া ভাব। জায়গাটাই

কেমন পাল্টে গেল। এই ভাবে জ্বালা, যন্ত্রণা, অস্বস্তি নিয়ে থাকা যায় না। অনেকদিন থেকেই পালাই পালাই করছিল, মাঝির কথায় আর কোন বাধ রইল না।

পরদিন ভোরে মাঝিকে একটা পেন্নাম করে রসিক আবার পথ ধরল। কিন্তু পথে নেমে জ্বালা বাড়ল। ঘরে এতদিন ঠাকরুণ সব কিছু ছড়িয়ে ছাপিয়ে ছিল, এখন সাথ ধরল। নানান্ মানুষ, নানান্ ব্যাপারে রসিক মেতে থাকতে চায় কিন্তু কিছুতেই মতিঠাকরুণকে ভুলতে পারে না। যতই ভাবে ঠাকরোণকে ভুলতে হবে, ঠাকরোণের ভাবনা থেকে রেহাই পেতে হবে, ততই ঠাকরোণের চিন্তা তাকে পেয়ে বসে। ঠাকরোণ যেমন নিঃশব্দে তার পাশে এসে বসত কিংবা আচমকা ধাক্কা দিয়ে তাকে ঘাবড়ে দিত তেমনি নিঃসাড়ে ঠাকরোণ আজকাল কাছে আসে মনের আনাচে কানাচে কেমন এক রহস্যের হাসি নিয়ে চলাফেরা করে, কিছুতেই এ দৃশ্য, এ ভাবনা দূর করা যায় না।

ঠাকরোণ যখন হাসত, ঠাট্টা তামাশা করত তখন তাকে চেনা সহজ ছিল, তার সঙ্গে সহজে মেশা যেত। কিন্তু যখন একাকী আনমনে উদাসীর মতো বসে থাকত, কোন ভাবনায় তলিয়ে যেত, সেই সাড়াহীন শব্দহীন বিবাগী ঠাকরুণকে বোঝা যেত না, কাছে যেতে যেন কত সঙ্কোচ, মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা উঁকি মারত, ভয় ভয় করত। ঠাকরুণের হাসি বোঝা যায়, কান্না বোঝা যায়, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে ঠাকরুণকে বোঝা যায় না, তাই অমন আকস্মিক মৃত্যুটাও রসিকের কাছে একটা বিরাট জিজ্ঞাসা হয়েই রইল।

রসিক অনেক ভেবেছে, সেই শেষ রাতে বেড়াতে যাওয়ার পর থেকে সমস্ত ঘটনা মনে মনে বিচার করে দেখেছে কিন্তু কোন সমাধান খুঁজে পায় নি। সেদিনের সন্ধ্যেরাতের ঘটনায় বিব্রত হলেও, মতিঠাকরুণের ওপর সবটুকু দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে পারে নি, নিজের মনের পাপটা তো অস্বীকার করতে পারে না। এ সব ঘটনা হঠাৎ হঠাৎ হলেও কোথাও যেন যুক্তি আছে, নিজের মনে যেন প্রশ্রয়ও আছে। তাই বিব্রত হলেও এ সব নিয়ে দুশ্চিন্তা হয় নি, কিন্তু সেই ঘটনার পর লাল পাড় শাড়ি পরা ঠাকরুণকে তাকে কোলে নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ার অর্থ তার কাছে কেমন রহস্য হয়ে আছে। সে দৃশ্য মনে পড়লে বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে, তার বুকেও একটা নিঃশব্দ কান্না ডুকরে ওঠে। তারপর থেকেই ঠাকরুণ কেমন পাল্টে গেছে, কেমন আনমনা, ক্ষণে ক্ষণেই নিজের চিন্তায় তলিয়ে যায়। সেই ঘোর ঘোরের মধ্যে ঠাকরুণের কথাগুলো বুকে বড় বাজে,

না গো, বিহা করি লাও, ইই তো সুময, যি ম্যাইয়া আসবে উয়ারও তো একটো সাধ. আহ্লাদ আছে।……হ সিই খেঁটে খেলার বয়স থেকিই লিজের চেহারা দেখি কেমুন আঙা হতেম।……তা কপাল দেখ……ইয়াকে বিহা বুলে না পুষ্যি লেওয়া বুলে, বুড়ো যেন ভিন্ কাউরোর জন্যি আমাকে পালছে…। এই সব কথায় রসিকের বুকে বেদন ঝরেছে। অন্যমনস্ক ঠাকরুণের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সেই হাসি খুশি মানুষটাকে কোথাও খুঁজে পায় নি। ঠাকরুণের পাটে যাওয়ায় মন কেমন করলেও, ভয় ভয় করলেও ঠাকরুণ যে আত্মহত্যা করতে পাবে, এমন কল্পনাও সে করতে পারে নি। কোন যুক্তি বা অর্থ খুঁজে পায় নি। সেদিনকার সেই কান্নার মতো সবটাই কেমন রহস্য হয়ে আছে। আর তাই রসিকের যন্ত্রণা দিনে দিনে বেড়েছে। থেকে থেকে একটা অপবাধ বোধ মাথাচাড়া দেয়। ও স্থির থাকতে পারে না। আজ এখানে কাল সেখানে। কী এক যন্ত্রণা তাকে তাড়া করে ফেরে। একটু একলা হলেই বুকেব মধ্যে কুরে কুরে দাগ পড়ে, নিজের দায়িত্বটা বড স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঠাকরুণের হাসি ঠাট্টা কান্নার মধ্যে নিজের অপরাধ বোধটা অসহ্য হয়ে দাঁড়ায়। যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে ওঠে রসিক। তার ওপর মতিঠাকরুণের সেই ধিক্কার, পুরুষ হয়েছে, পুরুষ!

যেখানেই একটু স্থির হয়ে বসে সেখানেই সাধন মাঝির কথা, মতিঠাকরুণের খিল খিল হাসি তাকে পাগল করে তোলে। ওর খাওয়া নেই, ঘুম নেই, কোথাও তিষ্ঠোতে পারে না, কিছুই ভালো লাগে না।

মানুষের পিছন পিছন হাঁটতে হাঁটতে ও একদিন কীর্ণাহার স্টেশন পেরিয়ে বৈরাগীতলার মেলায় এসে পৌছাল। সেই হৈ চৈ, বেচাকেনা, হাজার মানুষের ভিড়। অনেক দিনের মেলা বলে বহু দূর দূর থেকে মানুষ এসেছে, গরুর গাড়িতে দু-চার দিনের সংসারও বেঁধে এনেছে। দু'মুঠো রেঁধে, মেলা বেড়িয়ে, এখানে ওখানে শুয়ে দিন কাটছে। চতুর্দিকে মাইক, চোঙা, মানুষের কোলাহল। রসিক একলা একলা কোথায় কোথায় পড়ে থাকে। দু'মুঠো কোনদিন জোটে, কোনদিন জোটে না। ওর শরীর থেকে ক্ষিদে তেষ্টা সব যেন হারিয়ে গেছে। মাঘের ঐ প্রচণ্ড শীতে ও কখনও খোলা আকাশের নিচে, কখনো গাছতলায় শুয়ে থাকে।

নিজের শরীরটার প্রতি ওর আর কোন মায়া নেই। এই শরীরটার জন্যেই তো এত জ্বালা, এত অশান্তি!

কিন্তু এত অনিয়ম রসিকের সহ্য হল না। মাঘের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ফাঁকা জায়গায় শুয়ে থাকতে থাকতে একদিন ওর ভীষণ জ্বর এলো। উঠে যে কিছু খাবে কিংবা ওষুধ যোগাড় করবে তেমন ক্ষমতা রইল না। একটা গাছতলায় জ্বরের ঘোরে বেহুঁশের মতো পড়ে রইল।

জ্ঞান ফেরার পর দেখল, এক ছিটেবেড়ার ঘরে ও শুয়ে আছে। মাথার কাছে সাবুর বাটি, ওষুধের শিশি। ঘরের দড়িতে ক'টা শাড়ি, শায়া গোছানো।

কিছুক্ষণ পর ওর কানে একটা গুনগুন স্বর ভেসে এলো। কে যেন দরজার ওপরে বসে গাইছে—

লাগর, পীরিত দিবে, পীরিত লিবে,
পীরিতি তো চিনলে না,
চাও পয়সা-পীরিত, বচন-পীরিত
পরাণ-পীরিত খুঁজলে না।

রসিককে খুক খুক করে কাশতে দেখে মেয়েটি তেমন গুনগুন করতে করতেই ঘরে এলো, কি লাগর, লিদ্রে ভাঙল? তার পরই একটু ঝাঁঝিয়ে বলল, কেমুনধারা মানুষ তুমি গা? শ্যাষ মাঘের হিম-বসা শীত আর তুমি কি না গাছতলায় শুয়ে ছিলে!

মেয়েটাকে ঝুঁকে হাসি হাসি মুখে প্রশ্ন করতে দেখে রসিক অবাক হয়েছিল। পরে থেমে থেমে বলল, একটু জল দিতি পারো?

মেয়েটা তেমন ভাবে ঠোঁট কেটে বলল, ই বয়সে অত তিষ্টে কেনে গো লাগর? ঝি বউয়ের সঙ্গি কাজিয়া কর্যা ঘর ছাড়ছ? তারপর একটু থেমে বলল, কিন্তু লাগর, আমি যি লষ্টা মেয়ে, আমার হাতে জল খাবে, ধম্ম যাবে না?

রসিক ম্লান হেসে বলল, তু আমায় বাঁচালি ইটা অধম্ম না হয়ে থাকলে, তুর হাতে জল খেলে আমার অধম্ম হবে না। জীবনে তো কুনো ধম্ম কম্ম করি নাই, অধম্ম তো আমার পিছে পিছে ফিরছে, যদি তুর হাতে জল খেলে অধম্ম হয়, উয়াতে আর কি বেশী হবে?

বেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রসিকের শরীরটাও একটু ঝরঝরে হল। হয়তো জ্বরটা ছাড়ছে। এর মধ্যে বার দুই ওষুধ আর ক'বাটি সাবু খেয়েছে।

প্রত্যেকবারেই মেয়েটা একটু দ্বিধা করেছে কিন্তু রসিকের খোলামেলা কথায় ওর সেই ইতস্তত ভাব কেটে গিয়েছিল।

বেলা পড়ে আসার সাথে সাথে কনে দেখা আলোয় বৈরেগীতলার মাঠ ঝলমলিয়ে উঠেছে। আশেপাশের গাঁ থেকে মানুষ, মেয়ে, বাচ্চারা কলরব করতে করতে মেলায় জমছে। গো-গাড়িতে দু-চার দিনের সংসার পেতেছে যারা, তারা সব বেলা পড়তে পড়তে সাজগোজ করছে। দোকানে দোকানে হাকডাক। হরেক সওদার হাট বসেছে। বোঁ বোঁ করে নাগরদোলা, ঘূর্ণী ঘুরছে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ কর্‌র্ করে বেলুনের শব্দ উঠছে। মাইকে, চোঙে গান বাজনা, লোক জুটানো শুরু হয়েছে। ব্যাপারীদের হাতে ডুব্‌কি, চরকি, ক্যার-কেরে, ভেঁপু বাজছে। লোক জুটছে।

শুয়ে শুয়েই রসিক ঐসব শুনতে পাচ্ছিল। মেলা যে জমে উঠছে, বুঝতে পারছিল। এমন সময় খুব সেজে গুজে কয়েকটা মেয়ে ঠেলাঠেলি করতে করতে ঘরে ঢুকল। রসিককে তাকিয়ে থাকতে দেখে ওদের মধ্যে একটি ছিপছিপে শ্যামলা মেয়ে জিজ্ঞেস করল, কি লাগর, জর ছাড়ছে?

রসিক মাথা নাড়তে না নাড়তেই আর একজন ভারী গতরের মেয়ে বলে উঠল, জ্বালা ধরে নি তো? তারপর সুর কেটে বলল, পীরিত জ্বালা বিষম জ্বালা ধরলি পরে ছাড়ে না। কি লাগর, ই জর জ্বালা, না পীরিত জ্বালা, ঠিক মতু বুল, নেহাত যখুন আসি পড়িছ, চিকিৎসে তো আমাদেরই করতি হবে।

রসিক ওদের রকম সকম দেখে ঘাবড়ে যায়। কী বলবে, এ সব মেয়ের মুখের বার নেই। বললেই হল। ও কিছু বলে না, তাকিয়ে থাকে।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে সেই ছিপছিপে শ্যামলা মেয়েটি ঠোঁট কেটে বলে, কি গো, বুবা নাকি, না ভড়ং, না লিশায় পেয়েছে? তারপর একটু থেমে বলে, অ বুঝেছি, ই বচন-পীরিতের কম্ম নয়—বলতে বলতে মেয়েটা হঠাৎ উঠে আসে। রসিকের রুগ্ন শরীরে বুক দিয়ে কান পাতে তারপর চোখ মটকে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, ধরিছে, রোগে ধরিছে, ই ব্যামো সারবে না। হ্যাঁ রে লয়ন, লাগরকে উপোষ রাখছিস নাকি? হায় হায়, তুর এখুনো জ্ঞানগম্যি হল নি, ছাখ তো, ব্যাচারির মুখটো শুকায়ে আম্‌সি হই গেছে। আহা রে—স্‌তু স্‌তু করে করে জিভে শব্দ করে রসিকের মুখে বুকে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, চল লাগর, আমার ঘরে চল, তুমার কুনো জ্বালা থাকবে না, সব উসুল করি নিও, পুষিয়ে দিব।

রসিক অবাক হয়ে ওদের কাণ্ড দেখছিল। তার শরীর একে ক্লান্ত তার ওপর এই রসিকতা ভালো লাগছিল না। কিছুটা নিরুপায় হয়ে সহ্য করছিল।

মেয়েটা ওকে চুপ করে থাকতে দেখে ঠোঁট কেটে হাসল, কি লাগর, মুন উঠল না লাগছে। তা যাচাই করি লাও, তুমার লয়নের গতরের চে আমার গতরে কম্‌তি কিছু নাই। টাট্টু ঘোড়ার মত্তু ই শরীলে জৈবনের দাপানি, ছ্যাখ না কেনে?

এক কোণে বসে নয়ন ওদের মজা দেখছিল। কিন্তু মেয়েটির ঐ সব বাড়াবাড়ি ওর সহ্যি হচ্ছিল না। একে অসুস্থ মানুষ তার ওপর পথ্য করে নি, দুবলা শরীর, ও সব মস্করা কি সহ্য হয়? রসিকের অবস্থাটা অনুভব করে নয়ন একটু ঝাঁঝিয়ে উঠল, পাখী, তুর উ সব কি হচ্ছে, ব্যারামি মানুষটার কথা তো ভাববি, উ সব রাখ, মেলায় যেছিলি, যা।

পাখী গালে হাত দিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, উরে বাস্‌, তুর গায়ে ফোস্কা পড়ল লাগছে? দেখিস্‌ লো, একেবারে তলায়ে যাস্‌ নে, আর সব মানুষগুলার জন্যি ছিটেফোঁটা রাখিস। লয়তো সব খ্যাপা কুকুরের মত্তু ছুটি ছুটি সারা মেলা দাপাদাপি করবে, আমাদের গতরে সি দাপানি শেতল হবে না। বলে মেয়েটা দুলে দুলে হাসতে লাগল।

সেই ভারী গতরের মেয়েটা একটু ঠেশ্‌ দিয়ে বলল, তা লয়ন, তু তো আজ মেলা ঘুরতি যাবি নে, ঘরে বসি ফুসুর ফুসুর কর, আমরা ঘুরি আসি, ই পুড়া কপালে তো ঘর-লাগর জুটল না। তা ভাই, দেখিস, উপুর পানিটুকুন বঁধুদের জন্যি রাখিস, উপরিটুকু পেলেই আমাদের বুক ভরবে।

পাখী বলে উঠল, ইস্‌, লয়নের দিতি বয়িই গেছে। কত ভাগ্যি, অমুন এক তাগড়া মুনিষ জুটেচে, তুর আক্কেলটা কেমুন ধারা, তু ভাগ চাস, ই কি ভাগ দেওয়ার? গাছ, তলার সবের যি জবর স্বাদ, তরিয়ে তরিয়ে লিতে হয়, ভাগ দিতি গেলিই বুক ফাটে। না রে লয়ন, তু পুষিয়ে লে সাঁঝ অবধি, আমরা মেলা চক্কোর দি আসি, বার-লাগররা ছুক ছুক করছে।

বলতে বলতে মেয়েরা শরীর দুলিয়ে চলে গেল।

জানালা দিয়ে ঘরে পড়ন্ত বেলার নরম আলো। সেই আলোয় ঐটুকুন ঘর ভরে উঠেছে। সেই আলোর আভা নয়নের শরীরে, চোখে মুখে। মেয়েদের জটলা থেমে যাওয়ায়, সেই শান্ত নিরালায় রসিক শুয়ে শুয়ে নয়নকে দেখছিল। নয়ন আলোর দিকে তাকিয়ে কেমন তন্ময় হয়ে আছে।

রসিক খুব ধীরে ডাক দিল, লয়ন!

নয়ন সাড়া না দিয়ে শুধু মুখ ফেরাল। ওর দু'চোখে কি রকম গভীরতা!

একটু কাছে আয় না—রসিকের স্বরে আবেগ ঝরে পড়ে।

নয়ন উঠে রসিকের মাথার কাছে এসে বসল। রসিক ওর হাত দুটো নিজের মুখে কপালে বুলিয়ে বলল, কি রে, যাওযা হল নি বুলে মুন খারাপ?

রসিকের কপালে আস্তে আস্তে হাত বোলাতে বোলাতে নয়ন বলল, উহুঁ।

তবে? তু অমন ঝিম মেরে গেলি?

এমনি। ই আলোয় কেমুন মুন কান্দে, সব ছাড়ি কুথাও চলি যেতি মুন চায়। ই আলোয ঘব থাকা দায়। ই আলোয বুক জুড়ায় না, জ্বালা ধরে, খাঁ খাঁ করে। ভালো লাগে না।

লাগব, ই আলো, কি বুলে জানো? দেখন-আলো। কনে দ্যাখ্যা আলো! ই আলোয় ম্যাইয়ের বুকে সুখ কলকলায়, ই আলোয় মরে সুখ, দেখে সুখ, লিজের কাছে লিজেক কেমুন অচিন অচিন ঠেকে।

তারপর রসিকের চোখে মুখে আঙুল ছুঁয়ে ছুঁযে বলে, লাগর, উয়াদের কথায় কিছু মুনে লিও না। উয়াদের আর কিইবা আছে, ই যে একটু হাসি মস্করা ই লিযেই অবা বাঁচি আছে। কুনো দুষ লিও না।

রসিক মুখ ফেরাতে ফেরাতে বলল, লয়ন, অরা অমুন সাজিগুজি কোতি গেল রে, তরেও ডাকছেল?

ম্লান হেসে নয়ন বলে, মেলা বেড়াতি, গতর দ্যাখায়ে লোক জুটাতি। অরা উই ঠমক লিয়ে ঘুরি বেড়ায়; লাগরদোলা চাপে, ঘূর্ণীর পাকে উয়াদের বুকের কাপুড় ওড়ে, অবা খিলখিল হাসি ছুঁড়ি মানুষেদের মুন ঘুরায়। ম্বিদমানে উয়াদের দ্যাখার ল্যাগে ভিড় হয়, মানুষে গতর চিনি লেয়।

লাচ দেখতি তো মানুষ জুটে না, দেহের টানে শরীল জুড়াতেই জুটে। তাই ছুক্রিদের মেলায় মেলায় গা দুলিয়ে, ঠমক জুড়ে, হাসির ফুল্‌কি ছুটিয়ে ঘুরি বেড়াতি হয়। দেহের জন্যি উয়াদের দাম, উয়াদের দেহের ল্যাগেই মানুষে পটে।

তুমি তো চৈত পাগুল মানুষ, মেলা বেড়ানে বোরেগী, বুঝবা তুমি, এ ঝুমরীদের রকম সকম তুমার অজানা লয়। মানুযে ঝুমরী বুলতে গান-বেচা ম্যাইয়ারে বুঝে, কিন্তু উয়াদেরও যি একটো জান আছে, জীবুন আছে, উয়াদেরও যি সুখ সাধ, আশটা আছে, ই কেহু জানতি চায় না। বুঝতি চায় না। তাই ঝুমুরীদের এই দশা! গান গাহার ল্যাগে বায়না করে কিন্তু দলটি উই গতর

দেখি বাছাই। যি দলে যেমুন দরের ম্যাইয়া, সি দলের তেমুন ডাক। সব্বাই সব বুঝে কিন্তু উপায় নাই, ই ভাবেই গা বেচে জীবুন কাটাতি হয়।

রসিক শুয়ে শুয়ে এই সব সুখ দুঃখের কথা শুনছিল। নয়নের ভারী কণ্ঠস্বরে ওর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠছিল। কিছু বলার নেই। সান্ত্বনা জানালে ক্ষোভই বাড়ে, রসিক বোঝে, নয়নের হাত দুটো নিজের মুঠোয় নিয়ে সমবেদনা জানায়, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না।

এই রকম গল্প করতে করতে কখন সূর্য ডুবে আঁধার নেমে এসেছে, ওদের খেয়াল নেই। ওরা নিজেদের ভাবনায় নিজেরা ব্যস্ত। এমন সময় ঘরের বাইরে মেয়েদের কলকণ্ঠে ওরা চমকে উঠল। সেই আগের দলটি হৈ চৈ করতে করতে ঘরে ঢুকল।

পাখী ঠোঁট কেটে বলল, কি রে লয়ন, তুর এখুনো কাপুড় পরা হয় নাই! তুর উই সাতজন্মের লাগরকে লিয়ে গুজগুজ করলেই চলবে? পরে রসিকের দিকে ফিরে বলল, আর তুমিই বাপু কেমুন লোক, মেয়েটাকে আটকে রেখেছ, উকে খেতিপরতি হবে না, তুমার পীরিতের কথা শুনালেই চলবে? বাইরে যে হাজার লাগর, উদের সুহাগ কে জানাবে গো? উ শালার মানুষগুলো তো আমাদের দিকে চোখ তুলেও তাকায় না। লয়ন না গেলে সব বনশুয়োরের মতুন ক্ষ্যাপে যাবে যি? বলতে বলতে পাখী খিলখিল করে হেসে উঠল।

লয়ন, কর কর তাড়াতাড়ি কর, আমরা এগোই। উদিকে পুড়ার বুড়ো আবার গালমন্দ শুরু করবে।

ওরা চলে যেতে নয়ন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। দড়ি থেকে কাপড় জামা পেড়ে নিয়ে দেখে রসিক তার দিকে তাকিয়ে আছে।

নয়ন ফিক্ করে হেসে বলল, কি দেখছ গো লাগর? ম্যাইয়া লোক কখুনো দেখ নাই না কি? অমুন করে ম্যাইয়ালোকের দিকে তাকাতে নাই, উতে বুকে মুচোড় দেয়, চোখে সুহাগ লাগে।

তারপর কাপড় পরতে পরতে বলল, তুমি বাপু একটু উদিকে মুখ ফিরাও, আমি কাপড় ছাড়ি।

বেশ কিছুক্ষণ পর নয়ন যখন কাপড় চোপড় পরে বেরোতে যাবে রসিক তখন ডাক দিল, লয়ন!

নয়ন মুখ ফিরিয়ে বলল, দূর বাপু, অমুন করে ডাকো কেনে?

লয়ন, তু কুথায় যাবি?

সগ্‌গে! যাবে তুমি? খিলখিল করে হেসে নয়ন বলল, দেখছ না, কেমুন সগ্‌গের বেশ! হ্যাঁ গো, আমাকে কেমুন লাগছে বুল না? অমুন করে কি দেখছ বুল তো? মুনে লাগছে, তুমি কুনোদিন ম্যাইয়ালোক দেখ নাই। শুন, তুমি শুয়ে থাকো, দরজা ঠেসান রইল। দেখো আবার ঘুমায়ে পড় না, মেলায় যা ছিঁচ্‌কের উৎপাত। বলে একটু হেসে নয়ন বেরিয়ে গেল।

বাইরে তখন বেশ হৈ চৈ শুরু হয়েছে। শুয়ে শুয়েই রসিক বুঝতে পারল, মেলা জমে উঠেছে। নানান্ সওদার নানান্ চিৎকার। ম্যাজিক, সার্কাস পার্টির চোঙের আওয়াজ, সিনেমার মাইকের শব্দ, বাউলদের একতারার টুং টাং শব্দ—সব মিলিয়ে মেলার একটা বিচিত্র সুর স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রসিক তার নানান্ মেলা দেখার অভিজ্ঞতায় এই সুর শুনলেই বুঝতে পারে মেয়েলোকের গতর বুঝে নেবার মানুষ আর চোর ছ্যাচড়ের আমদানি বাড়ছে। সুযোগ পেলেই চুড়ি, মাকড়ি, কানপাশা, পাশপকেট, বুকপকেট সব ফাঁকা করে সরে পড়ছে। তাই রসিক একটু সজাগ থাকতে চেষ্টা করে।

হঠাৎ এই সব নানান্ হট্টগোল ছাপিয়ে হারমোনিয়ম, ডুগীর আওয়াজ তার কানে ভেসে এলো। তার অভ্যস্ত কানে সেই চটুল সুর, হাল্কা ঠেকা ধরা পড়ল। তারপরেই শুনতে পেল একদঙ্গল লোকের উল্লাস, ইনিয়ে বিনিয়ে মেয়েগলার গানের কলি আর ঝুমুরের শব্দ। বুঝতে পারল, এই ঘরের কাছেই ঝুমুর নাচের আসর বসেছে।

ও এই ঝুমুর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছে কিন্তু কখনো ওদের কাছাকাছি থেকে দেখার সুযোগ হয়নি। কেমন একটা কৌতূহল আছে। নয়নের কাছাকাছি থেকে, নয়নের মুখে ঝুমুর সম্পর্কে কিছু জানতে পেরে ওর মনের সেই কৌতুহলটাই বেড়েছিল। অত কাছ থেকে ওদের দেখা, ওদের জানার তাগিদটা তাকে চঞ্চল করে তুলছিল। আজকের জমাট মেলার মধ্যে ঝুমুরের গানে তার অসুস্থ শরীরটায় এক ধরণের প্রত্যাশা ছটফটিয়ে উঠল। সে শুয়ে শুয়ে বাইরের সেই পাঁচমেশালি কোলাহলের মধ্যে ঝুমুর নাচ গানের টুকরো টুকরো কলি শুনতে শুনতে কেমন বিভোর হয়ে গেল।

তখন বাইরে দারুণ মত্ততা। একদল নানান্ বয়সের পুরুষ চারিদিকে গোল হয়ে ঘিরে আছে। কেউ বসে বসে হাঁটু নাচাচ্ছে, কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোড়ালি ঠুকছে। আর তাদের মাঝে ছোট ফাঁকা জায়গা। এক পাশে এক ডুগীবাজিয়ে। অন্য পাশে হারমনিদার; মাঝখানে বুক কোমর দুলিয়ে দুটো মেয়ে গাইছে, নাচছে। পায়ে তাদের পিতলের ঝুমুর, পরণে এক জেল্লাদার ফিন্‌ফিনে শাড়ি, শাড়ির নিচে টকটকে লাল সায়া। যখন গাইতে গাইতে ঝুমুরী বন্ বন্ করে চরকির মতো শরীর ঘোরায় তখন শাড়ি সায়া হাঁটু ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা উপরে উঠে যায় আর হাঁটুর ওপরে ফর্সা জানুর দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে দর্শকরা ছটফটিয়ে ওঠে। উল্লাসে ফেটে পড়ে, কেউ কেউ হাতের বোতলটা গলায় উপুড় করে দেয়।

শাড়ি সায়ার ফাঁসটা তলপেটের অনেক নীচে। বেরিয়ে থাকা নাইকুণ্ডলী ঘিরে ঝুমুরীরা কুমকুম দিয়ে নক্‌শা কাটে। জায়গাটা কেমন চকচক করে, রক্তে সাড়া পড়ে যায়। নাচতে নাচতে যখন ওরা কোমর দোলায় তখন চিত্রিত তলপেট কাঁপতে থাকে। দর্শকদের কেউ আর ধৈর্য ধরতে পারে না। জিভ উল্‌টে সিটি দিয়ে বুড়ো আঙুলে একটা সিকি কি আধুলি টুসকি দিয়ে বাজাতে থাকে। আর নাচিয়ে ঝুমুরী কোমর নাচাতে নাচাতে দু'হাতে শাড়িটার প্রান্ত দু'পাশে একটু টেনে তুলে তার কাছে যায়। বসে থাকা লোকটা দু'হাতে তার কোমরটা জড়িয়ে ধরে ঠোঁট দিয়ে সেই চিত্রিত নাইকুণ্ডলীতে শব্দ করে চুমু খায়, তারপর সিকি কি আধুলিটা নাইকুণ্ডলীর গর্তে আঙুল দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। আর ঝুমুরী কোমর দোলাতে দোলাতে আসরে ফিরে আসে। এমন দৃশ্যে দর্শকরা বাহবা দেয়, হাঁটুতে তাল ঠোকে, দু'হাত ঘষতে ঘষতে চু চু আওয়াজ করে, আর ঝুমুরীদের তাড়া দেয়।

ডুগীর বোলে তখন তেহাই পড়ে। হারমোনিয়ামের সব ক'টা রীড ওঠানামা করে, ঝুমুরী জলদে গান ধরে—

সুহাগ লিবে তো লাগর ঘরে ফির না
যৈবন সুধা আমি দিতে পারি,
যেও না, যেও না, যেও না গো
বুকের সোয়াদ আমি দিতে পারি।

ছম ছম ছম করে ঝুমুরে শব্দ ফোটে। ঝুমুরীর পাতলা ছোট্ট ব্লাউজের ভিতর থেকে লাল্‌চে বডিস্ ফুটে বেরোয়। জলদের সুরে দ্রুত নাচের ভঙ্গীতে ঘন ঘন বুক নাড়তে থাকে। মাঝে মাঝে ডান হাত দিয়ে বুকের আঁচলটা তুলে পালের মতো

মেলে দেয, বুকে আর আবরণ থাকে না। দুলতে দুলতে, নাচতে নাচতে, ঘুরতে ঘুরতে বুক ঝাড়া দেয়। সমস্ত শরীরটায় তরঙ্গ ওঠে। কখনো বাঁ চোখটা কখনো ডান চোখটা মট্‌কে, ঠোঁট কেটে এক ধরণের হাসি ফুটিয়ে তোলে। দু'হাতে শাড়ির দু'প্রান্ত তুলে ধরে পাক খেতে খেতে গলা ছাড়ে—

রকম সকম দেখে মরি লাজে গো
ভাতার চলে পরের ঘরে
ম্যাগ করে লিকে গো ;
চুক চুক চুক আহা সুখের কথা গো,
কেউ গিলছে মেঠো পানি
কেউ গিলছে তালের রস,
হায় গো, ম্যাগ ভাতারে ছাওয়াল হল, বাঁটের কোলে কড়ি গো।

ঝুমুরী দুলছে। সাপিনীর মতো দুলছে। চোখে চোখে কথা ফুটছে। কাপড় চোপড়ের ভারে যেন শরীরটা হাঁসফাঁস করছে। মাঝে মাঝে পাক খাচ্ছে, ঘাগরার মতো কাপড়টা জাঙের অনেক উপরে উড়ে যাচ্ছে। কোমরে মুহুর্মুহু দোলা। ঢোল তবল্‌চি, হারমোনিয়ম-বাজিয়ে সব একসাথে ঝম ঝম চড়া সুরে গৎ বাজায়। চারিদিকে মাতাল দর্শক হৈ হৈ, চু চু, লে লে বলে বাহবা দেয়। দর্শকের, বাজিয়ের, নাচিয়ের সকলের চোখে নেশা। সকলের স্নায়ুপ্রত্যঙ্গ উত্তাল হয়ে ওঠে। সকলের সম্মুখে এই গাছ মাটির জগতের চেহারাটা পাল্টে যায়।

মুহুর্মুহু বাহবার মধ্যে উত্তেজিত দর্শক ফেরী দেখায়। কারুর রুমালে দুআনি, সিকি বাঁধা, কারুর কপালে একটা চকচকে সিকি, কারুর দাঁতের ফাঁকে একটা আধুলি। ঝুমুরী দুলতে দুলতে এক একজনের কাছে যাচ্ছে। মত্ত মানুষ ঝাঁপিয়ে অন্যজনকে ডিঙিয়ে তাকে কেড়ে নিচ্ছে, সুখ কাড়তে চাইছে। বাকী ঝুমুরী তখন দুলছে—নাচছে—হাসছে। ফেরী উঠছে, একজন গিয়ে পাশে বসছে। অন্যজন উঠে আবার বুক কোমর দুলিয়ে নাচছে।

দর্শকদের কেউ যখন আধুলি ছেড়ে টাকা দেখায় তখন ঝুমুরীদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। মত্ত মানুষ পছন্দসই ঝুমুরীর চোখে বুকে টর্চ টেপে। মনোমত ঝুমুরীকে একেবারে বুকে তুলে নাচতে থাকে। বাকী দর্শকরা তারিয়ে তারিয়ে তাদের কেল্লা দেখে। সেই মত্ততার মধ্যেই কোন কোন ঝুমুরী আবার কারুর বুকে ঝুলতে ঝুলতে আড়ালে চলে যায়। তখন চারিদিকে মত্ততা বাড়ে। শরীরের নেশা যেন আর বাগ মানে না। ওদিকে রাত গভীর হতে শুরু করে।

নয়নের শরীরটা আজ আর চলছিল না। কাঁধের কাছে কে যেন কামড়ে দিয়েছে। কোমর জাঙেও যেন নখ ফুটেছে, চিরে গেছে। সেই উত্তেজিত পরিবেশে ওর শরীরের এই জ্বালাগুলো বড় অসহ্য মনে হচ্ছিল।

ওকে অমন ভেঙে ভেঙে পড়তে দেখে কত্তা এক ফাঁকে বাজনা থামিয়ে বলেছিল, তু একটু টেনে লে লয়ন, তুর শরীলে যে ফুল্‌কি ছুটছে না।

কিন্তু নয়নের আজ আর এ কথায় তেমন তাগিদ এলো না, বরং শরীরটা টেনে হিঁচড়ে নাচতে লাগল। আজ তার শরীরের দিকে তেমন ডাক পড়ছে না। এতে ও কিছুটা স্বস্তিই পাচ্ছিল। অন্যদিনের মতো যদি আজো এই সব মানুষ তাকে ছেঁড়াছেঁড়ি করত তাহলে ওর আর সহ্য হত না, হয়তো সে ধকল সামলাতে তাকে আসর ছেড়ে পালিয়ে যেতে হত।

অথচ অন্যদিন! নয়নের হাতে পায়ে আঁকা লাল কালো উল্কিতে চুমো খাবার জন্যে কী কাড়াকাড়ি! ওর নক্‌শা আঁকা তলপেটে ঠোঁট বুলাবার জন্যে মানুষগুলো পাগল হয়ে ওঠে। ওর শরীরে যে কী আছে, ও আসরে নামলে মুহূর্তে আসর মাতাল হয়ে যায়। পাগলা হাতির মতো লোকগুলো চুক চুক, হৈ হৈ আওয়াজ দেয়, মুহুর্মুহু ফেরী ওঠে।

নয়ন আজকাল কিছুটা সেয়ানা হয়েছে। সিকি, দুআনিতে ও আর এগোয় না। আধুলিতে শুধু ঠোঁট দিয়ে মানুষের কপাল কিংবা ঠোঁটের ডগা থেকে পয়সা তুলে নেয়। সুখ কাড়তে চাইলে আরো কিছু খসাতে হয়।

উত্তেজিত মুহূর্তে ও যখন পাক খায়, দেহে ঘূর্ণী তোলে, তখন মানুষগুলোর চোখ লালসায় ঝকঝক করে জ্বলে ওঠে, ঠোঁট চাটে, জিভ দিয়ে তালুতে টা টা আওয়াজ দেয়। কোমরের লাল কালো উল্কিটা ঝিলিক মারতে থাকে আর সেই মুহূর্তে আসরে বল্‌গা ছেঁড়া ঘোড়ার দাপাদাপি শুরু হয়। মানুষগুলো সব হৈ হৈ, চু চু ধুয়ো দিতে দিতে তার পায়ের গোছা লক্ষ্য করে ছুটে আসতে চায়।

আজ কিন্তু নয়ন নক্‌শা উল্কি আঁকতে ভুলে গেছে। তার শরীরও অন্যদিনের মতো ছটফটিয়ে উঠছে না। ওর আজ এ সব ভালো লাগছে না। কোথা থেকে রাজ্যের ক্লান্তি তাকে ঘিরেছে।

কত্তাকে বলে নয়ন সেদিনকার মতন ছুটি নিল। ওদিকে আসর ভাঙার সময়ও হয়ে আসছিল। ঐসব মাতাল মানুষগুলোর চোখে মুখে ক্রমে ক্লান্তি ফুটে উঠেছে। ঝুমুরীদের উচ্ছল গতিও ক্রমে শিথিল হয়ে পড়ছে। তাই নয়নকে চলে যেতে কত্তা আর বাধা দেয়নি।

দূরে বাঁশবনের মাথার উপর শুকতারাটা জলজল করে জলছে। আশেপাশের গাছের পাতা থেকে শিশির ঝরে পড়ার টুপটাপ শব্দ। সারাদিনের জমজমাট মেলা এখন কেমন যেন কুঁকড়ে মৃতের মতো পড়ে আছে। দোকানচালা থেকে মিট মিট করে লণ্ঠনের আলো দেখা যাচ্ছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দূর গাঁয়ের যাত্রীদের টাপা-অলা গরুগাড়িগুলোর নিচে লণ্ঠন ঝুলছে। তাদের রান্না করার আখা থেকে এখনো পোড়া কাঠের আগুন ছাইগাদায় ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে জলছে। নয়ন তার ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে টেনে ঘরে ফিরল।

ঘরের সামনের উঠোনে তখন রাঁধুনীবুড়ি বসে বসে বিড়ি টানছিল আর বিড বিড করে আপন মনে বকছিল। যাবার আগে নয়ন বুড়ির হাতে একটা আধুলি দিয়ে একটু জেগে থাকতে বলেছিল। হাজার হোক ঘরে একটা রুগী পড়ে আছে, তাছাড়া দরজা খোলা, চোর ছ্যাঁচোড়েরও তো ভয় আছে।

বুড়িকেও নয়ন আর ডাকল না। ওর আজ আর খিধে নেই। কেমন যেন ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। এখন একটু হাত পা ছড়িয়ে শুতে পারলে বাঁচে।

ভেজানো দরজাটা ঠেলা দিতেই খুলে গেল। ঘরের মেঝেয় তেমনি ভাবে রসিক শুয়ে ঘুমোচ্ছে। লম্ফটা মিটমিট করে জলছে। পলতের মুখে গোটা গোটা লাল লাল আগুনের ফুলকি জমেছে। শিসটা দুলে দুলে উঠছে। সেই স্বল্প আলোয় নয়ন চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রসিককে দেখল। কেমন উড়ু উড়ু মানুষটা, দেখলেই মায়া হয়।

ঐটুকু তো ঘর। মাঝখানে রসিকের বিছানা। নয়ন জামা কাপড় ছেড়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়াল ঘেঁষে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে শুলো। মাঘের প্রচণ্ড শীত। কাঁথা ক'টা তো রসিকের বিছানাতেই গেছে। নয়ন একটা চট পেতে আর একটা চটে গা ঢেকে শুয়ে পড়ল।

আজ সারা সময় ওর মনের মধ্যে ঘরের মানুষটার জন্য একটা ভাবনা উঁকি দিচ্ছিল। মানুষটার সঙ্গে কতক্ষণই বা আলাপ তবু মানুষটাকে আপন ভেবে সুখ। কি রকম আলগা ভাবের মানুষ, ছাড়া ছাড়া স্বভাব, ক'দণ্ডেই তার ওপর সব দায় চাপিয়ে খালাস। ওর আর নিজের সুখ সাধ কিছু নেই, নয়ন হাত তুলে না দিলে ওর বুঝি কোন তাগিদ নেই, এমন স্বভাব মানুষটার। নয়নের ওপর নির্ভর করে ও নিশ্চিন্ত, এমন অসহায় মানুষকে কি ভোলা যায়, না মনের আড়াল করা যায়? নয়ন নিত্য দিনের মতো নাচ গান করলেও মন পড়ে ছিল এই ছিটেবেড়ার ঘরে, রুগ্ন মানুষটার কাছে।

এই রকম ভাবনায় যে এত সুখ, নয়ন জানত না। কোন মানুষের চিন্তায় যে এত তৃপ্তি, কি রকম এক তির তির ভালো-লাগা, বুক ভরে যায়, মন ভেসে যায়।

সেই ছোট্ট ঘরের এক কোণে, স্বল্প আলোয় মানুষটার মুখোমুখি শুয়ে নয়ন ঐ সব ভালো-লাগা সুখে কেমন তলিয়ে যাচ্ছিল। হয়তো কাল সকালে উঠেই মানুষটা চলে যাবে, ক' দণ্ডের পরিচয় সব হারিয়ে যাবে, মুছে যাবে, তবু এটুকুই নয়নের কাছে অনেক, প্রতিটি মুহূর্তের স্মৃতি নয়ন তার সঞ্চয়ের মণিকোঠায় সযত্নে তুলে রাখে, মনে মনে নাড়া চাড়া করে।

সেই শীত শীত রাতে, ক্লান্ত শরীরে নয়ন ঐ সব একান্ত চিন্তায় ভাসতে ভাসতে এক ফাঁকে ঘুমিয়ে পড়ে।

একটা মৃদু ধাক্কায় নয়নের ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখল, রসিক তাকে যেন কিছু বলছে। লম্ফটায় তেল বোধহয় কমে আসছিল তাই মাঝে মাঝে সেটা দপ দপ করে জ্বলে উঠছিল। সেই আলোয় নয়ন দেখল রসিকের চোখে মুখে কি অসীম মমতা ফুটে উঠেছে।

নয়ন ঘুম ঘুম চোখে একটু আড়মোড়া দিতে দিতে বলল, কি লাগর, এই রাত তুফরে তুমার আবার কি কাজ পড়ল?

রসিকের গলায় যেন স্নেহ ঝরে পড়ে, তু এ্যাই শীতে ম্যাঝেয় শুয়ে পড়লি, ডাকলি নে কেনে? গায় দিবারু কিছু নাই, খ্যাষ মাঘের ঠাণ্ডা আমায় লাগে, তুর লাগবে না?

রসিকের ভৎ´সনায় নয়নের বেশ মজা লাগল। হাসতে হাসতে বলল, তা তুমার কি হল? ই তো বেশ ছালা পাতি শুয়্যা আছি। গায়েও একটো জুটেছে। আর আমাদের গতরে ঠাণ্ডা খরা লাগে না, বুঝলে? লাও, ঘুমাও দিকি।

রসিক একটু হেসে বলল, হুঁ কেমুন শীত লাগে না তা তো দেখলুম। কুঁকড়ে তো শুয়ে ছিলিস। উ সব ছেঁদো কথা ছাড়, সব শরীলেই জারা খরা লাগে, তুর আমার বুলে খাতির নাই। তু ই বিসনায় এসে শো। ইটা তো বেশ বড়, ঢের জায়গা আছে, কুনো অসুবিধে হবে না।

রসিকের কথা শুনে নয়নের ঘুমের ঘোর কেটে গিয়েছিল। অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। ওর সেই ক্লান্ত ঘুমে ম্লান চোখ দুটোয় দ্বিধা ফুটিয়ে বলল, ই কেমুন কথা গো, তুমি আমার সাথে শুবে? তা কি হয়? এই বেশ আছি, আমি ইখানেই শুব।

রসিকের কণ্ঠে বেদনা ঝরে পড়ে, লয়ন, ইখানে শুলে তুর কি ক্ষেতি হবে? আমাব কুনো কষ্ট হবে না, তু আয়, ইখানে তুর আমাব কুলায়ে যাবে।

তুমি কেমুনধারা মানুষ গো, আমার সাথে শুবে? আমি যে লষ্টা মেয়ে। জল খেয়ে তো ধম্ম গেছে, ইবার তুমার স্বভাব যাবে।

দেখ্ লয়ান, স্বভাব চরিত্তিব তো লিজের কাছে। উ কি কেউ খারাপ করতি পাবে? আমি তো লিজেব ল্যাগে বুলছি না, তুর ল্যাগে বুলছি। এতটা রেত পয্যন্ত লেচে এলি। ইখুন শরীলটায় আরাম চাই, তু না এলে আমারও ঘুম হবে না। আয়, ইখানে এসে শো।

রসিকের ডাকে নয়নের বুকটা ভরে ওঠে। কোন পুরুষ যে এত সোহাগ ভরে ডাকতে পারে, কারুর ডাকে যে এত আদর থাকতে পারে, নয়নের জানা ছিল না। রসিক যে নিজের নেশায় ডাকছে না এটা বুঝতে তার কষ্ট হয় না। অনেক পুরুষ নেড়েচেড়ে পুরুষ চিনতে এখন আর নয়নের অসুবিধে হয় না। রসিকের কথায় বোঝে, ও যদি না যায় তাহলে ঐ রুগ্ন মানুষটাও ঠায় জেগে বসে থাকবে। অগত্যা নয়ন রসিকের বিছানার একধারে এসে শুয়ে পড়ে।

রসিক আর কথা বাড়ায়নি স্নেহভরে ওকে দু'হাতে ধরে ভালো ভাবে শুইয়ে দিল। নিজের কাঁথাটা ভালো করে বিছিয়ে নিল যাতে দুজনেরই শরীর ঢাকা পড়ে। নয়নের পা কাঁথার তলা থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। রসিক উঠে নয়নের পায়ে হাত দিয়ে কাঁথাটা টেনে দিল। নয়নের শরীরটা আরো কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল। ওকে অমন ভাবে শুয়ে থাকতে দেখে রসিকের কষ্ট হল। ও নয়নের পাশে শুয়ে এক হাতে ওকে আরো কাছে টেনে নিল।

নয়ন আর দ্বিধা করেনি বরং নিশ্চিন্ত আশ্রয় মনে করে ছোট্ট টুনটুনি পাখির মতো রসিকের বুকের মধ্যে ঘন হয়ে উঠল। একটা ছোট্ট শিশুকে ঘুম পাড়ানোর মতো রসিক নয়নের পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। আর নয়ন পরম সুখে নিবিড় শান্তিতে আহ্লাদী বউয়ের মতো রসিককে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ছিটে বেড়ার ফাঁক দিয়ে যখন ভোর রাতের আবছা আলো ঘরে উঁকি দিতে শুরু করেছে, বাইরের গাছগাছালিতে যখন নানান্ পাখির গান, নাচ শুরু হয়েছে

তখন কুয়াশা কুয়াশা ঠাণ্ডা ভোরে রসিকের ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের পাশে বওলা গাছে বোধহয় এক ঝাঁক চন্দনা এসে বসেছে। তাদের ডাকগুলো নানান্ সুরে বাজছে। এই সব বিচিত্র কাকলির মধ্যে রসিক নয়নের দিকে মুখ ফেরাল। ভোরের আলো আঁধারে নয়নের চোখ মুখ চুল শরীর একটু একটু আদল নিতে শুরু করেছে। তার শ্যামলা মুখ বড় আতুরে বলে মনে হল। তার অগোছালো কাপড় চোপড়ের মধ্যে আতুর শরীরটা একমুঠো যুঁই ফুলের মতো লাগছে।

রসিকের বাবার হাতে লাগানো যুঁই গাছটায় থোকায় থোকায় ফুল ফুটত। রসিক ভোরে সেই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা যুঁই গোছায় ঠোঁট বুলাত, মুখ ঘষত—কুয়াশায় ভেজা পাপড়ির সুখে ওর ঠোঁট, মুখ, শরীর শির শির করে উঠত। ভারী খুশি নিয়ে রসিকের দিন শুরু হত।

রসিক নয়নের কপালের ওপর নেমে আসা চুলগুলো আঙুল দিয়ে সরিয়ে দিল। তার চোখের কোলে এলিয়ে থাকা কালো জিরে জিরে পাতাগুলোয় আঙুল বুলালো। তার বুকের ওপর পড়ে থাকা নয়নের হাতটা তুলে আপন মুখের ওপর রাখল। নয়নের ঠাণ্ডা হাতের তালুর স্পর্শে রসিক এক ধরণের শান্তি পাচ্ছিল। শেষে ও দু'হাত বাড়িয়ে নয়নকে বুকে টেনে নিল। ওর কানের কাছে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে ডাক দিল, লয়ন, লয়ন!

নয়ন তেমনি ভাবে বুকের মধ্যে শুয়ে চোখ মেলে একটু হাসল, বলল, কি গো লাগর, এই বোরব্যানেই সুহাগ শুরু করলে, তুমার ধম্ম আর রইল না।

ওকে বুকে জড়িয়ে আদর করতে করতেই রসিক খুব গম্ভীর ভাবে বলল, লয়ন, তু আমার সাথে যাবি? ইখানে তুর কুনো সুখ নাই, সিখানে তুর ঘর হবে, ছ্যালে হবে, সোয়ামী হবে, লয়ন তু যাবি?

একটু চুপ করে থেকে নয়ন খিল খিল করে হেসে উঠল, লাগর, তুমার চোখেও লিশা লাগছে, আ পুড়া কপাল আমার, তুগি একটা লষ্টা ম্যাইয়ে লিয়ে ঘর বাঁধতি চাও! সিখানে তুমার সমাজ নাই, পড়শি নাই, ধম্ম নাই? উ সব কথা থাক, ইখানে আমার কুনো কষ্ট নাই।

ওর কথা শুনে রসিক অবাক, এখানে তুর কষ্ট নাই?, হাজারো মিন্‌সে কুকুর বিড়ালের মতুন তুরে ছিঁড়ে খেছে, দু'আনা চারআনার জন্তি তুর বুকে গতরে কামড়া কামড়ি করছে, আর তু বুলছিস, কুনো কষ্ট নাই?

লয়ন তু আমায় বাঁচায়েছিস বুলে কুনো কথা লয়, তুকে আমার ভাল্লেগেছে। কাল রেতে তু যখন ছ্যালের গায় ঘুমায়ে ছিলিস তখুন তুকে দেখে আমার বুক

কেমন আকুপাকু করছেল। তুর অমুন শেতল মুখটা দেখে আমার পরাণ কান্দছেল। তু বিশেস কর কুনো ম্যাইয়াব জন্যি আমার কখুন কষ্ট হয় নাই। এতটা বয়স হল কুনো ম্যাইয়াকে দেখি নিজের সুখের কথা, বিহ্যাসাদির কথা খিয়াল হয় নাই। তুকে দেখে তুর অমুন মুখটা দেখে বড কষ্ট হচ্ছেল। শ্যাষে যখন তু আমাকে জডায়ে বুকে মাথা দিয়া ঘুমায়ে পডলি, লয়ন তখুন আমার বউয়ের কথা মনে পডছেল। তুর মতুনই তো বউ অমুন করি লিদ্রে যাবে, আমার আদরে তুর মতুন খিল খিল করি হাসবে।

তু লিজেরে লষ্টা বুলছিস, তো একটা গান শুন, আমার সাথি এক বোরেগী বাবাজীর ঠ্যাখা হল্ছেল, উ শরীলের কথায় বুলছেল—

শরীলটো সুখের বটে
সুহাগ করি চোপদিন,
গোরে কিংবা চিতের ঘাটে
শরীল শ্যাষে হচ্ছে লীন।
তাই বুলি, নকল লয়ে পীরিত কেন, সুহাগ কেন, ও গোঁসাই,
মুন পীরিতের লাগর সেজে, সাঙ্গ কর সুখ যাচাই।

তা তুই বুল, শরীলটা তো চামে তোয়েরী, উয়ার ভালোমন্দে কি যায় আসে? উই সব মানসে উই চামেই তো মজে আছে কিন্তু উই চামের মধ্যি যে সুহাগ পাখি তার খপর কি কেউ রাখে? উই সুহাগ পাখিটারে তু আমায় দে, ওতেই আমার সুখ। আর ই শরীলের খিদে তিষ্টে তো আর দশজুনার মতুন উই চামের শরীলেই মিটতে পারে। শরীল তো গেরস্তের আখা, গোবুর ল্যাথায় বশ ফেরে। দশজনায় উ শরীল এঁচে বেডালেও, উতে দুষ নাই, মুন পীরিতই মোদ্দা কথা। মুনটা কষ্টিপাথর বে, সুহাগে খাদ থাকলে ঠিক আঁক কষবে। তুর মুনে খাদ নাই তাই তুর এত দ্বিধে।

লয়ান, তু না করিস নে। সেই কুন্ বয়সে পথে লেমেছিলুম আজো ঘরে ফিরা হল না। বুডো বাপ বাঁচি আছে কি মরেছে তাই জানলেম না। তুরে দেখে আমার ঘরের কথা মুনে পড়ছে। বয়সটা তো কম হল না, ইবার ঘর বাঁধব, বিহ্যা করব, তুর আমার ছ্যালে হবে। লয়ান, তু আর না করিস নে।

নয়ন কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল। শেষে বলল, লাগর, তুমার কথাটো আমি বুঝি কিন্তু তা হবার লয়। সবলোকে তুমাকে দেখায়ে বুলবে, ঐ দ্যাখ মানুষটা একটা লষ্টা ম্যাইয়ে লিয়ে সুখ কাড়ছে, পীরিত করছে—ইতে আমার

বুক ফাটি যাবে, ই আমি দেখতি পারব না। তুমার গায় আমার ল্যাগে কাদা লাগবে, ই হতি পারে না। আমি তো অল্যায় পাপে ডুব্যা আছি। আমাকে কেউ যখুন রাঁঢ়, খান্‌কি, বেবুশ্যে বুলে গাল দেয়, আমার লাগে না। আমি উ-ই, কিন্তু তুমায় বুলবে কেনে? উ আমার খুব লাগবে, বুকে বাজবে, আত্মহত্যি করতি হবে।

লাগর, তুমি এমন হুকুম কোর না। তুমি ঘর যাও, বিহ্যা সাধি কর, একটো ছোট্ট আভাপারা বউ দ্যাখে লিয়ে আস, বছর ঘুরতি না ঘুরতি কোল জোড়া টুকটুকে ছ্যালে আসবে, তুমার বউয়ের দুধাল বুকটা টলটল করবে, র‍্যেতে উই আহ্লাদি বউটো তুমার ঠেয় সুখ কাড়বে।

লাগর, তুমার বিহাতে দু'র‍্যাত ঝুমুর দিও। আমি যেয়ে তুমার রাজবংশীদের, তুমার কুটুমদের সুখ দিয়া আসব আর তুমার বউকে দেখ্যা আসব।

লাগর, ইই ভালো, তুমি বউ ছ্যালে লিয়ে সুখে থাকবে, ইতেই আমার সুখ। আমার মতুন লষ্টা ম্যায়েকে ভালো লাগা পাপ, লাগর, তুমি ঘরে ফির‍্যা যাও।

সেই শীতের ভোরে, কুয়াশাভাসা ভোরে, নয়নের ভারি ভারি কণ্ঠস্বর রসিকের বুকে একটা হাহাকার তুলছিল। রসিক, গভীর প্রেমে নয়নের মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়ে অবাক হল, নয়নের দু'চোখে জলের ধারা। নয়ন কাঁদছে। বুকের অবরুদ্ধ বেদনায় ওর ঠোঁটদুটো থর থর করে কাঁপছে, চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে।

সস্নেহে ওর চোখ মুছিয়ে রসিক বলল, লয়ন, তু কান্দছিস্? পাগলি, সমাজকে তু আমার চে ভাল চিনিস? লুকে তো বুলবেই, আমি কি ই সব না বুঝেই বুলছি? শুন আমার গুরু সাধন মাঝি বুলত, বুকে বাজলেই বুঝবি তুর পাপ খলন হইছে। লুকে বুলল, তু লষ্টা আর তু লষ্টা হয়ে গেলি? লুকে তো মতিঠাকরোণকেও লষ্টা বুলে কিন্তু মতিঠাকরোণ তো লষ্টা ছিল না। উয়ার বুকে বড় যন্তনা ছেল রে, উয়ার যৈবন ছেল, শরীল ছেল, সাধ ছেল, কিন্তু উকে লয়ে সুখ করার মানুষ ছেল না। উয়ার বুকে একটা ছ্যালেভুলো মা লুক্যে ছেল। উয়ার জন্তি উ ছুটে ছুটে আসত, শরীলের জ্বালায় জন্তি লয়, একটা কোল জুড়ানো ছ্যালের ল্যাগে উয়ার ভিতরে একটা জ্বালা ছেল। কিন্তু উয়ার দুধাল বুকটায় দুধ কাড়তে কুনো ছ্যালে এলো না। ই কি কম কষ্ট রে? ই কি সকলের চুখে পড়ে? লুকে উকে শরীল লয়ে জলতি দেখল, কিন্তু জলায়ে দেখল না। তাই লুকের কথায় কি যায় আসে।

পীরিতির আবার ভালো মন্দ—উই যে কথায় আছে না, মুনে সন্ধ ভালো মন্দ বিচার করি আপুন খ্যালে, উ সব ল্যাগে আমার ভাবনা নাই। সমাজ দুষবে, একঘরে করবে তাতে কি হল—তু লাচবি, আমি আলকাপের দল গড়ব, দেখবি কেমুন সুখে দিন কাটবে। বছর ঘুরতি তুর লধর বুকটায় একটো আস্ত ছ্যালে দুধ কাডবে, তুর পরান মন জুড়বে। তুর আর কুনো দুখ থাকবে না।

রসিকের কথায় নয়নের অবরুদ্ধ কান্না আর বাধা মানল না। রসিকের বুকে মাথা রেখে নয়ন হু হু করে কান্নায় ভেঙে পড়ল। তার জ্বালা ধরা বুকটায় রসিকের কথাগুলো কি অসীম শান্তি নিযে এলো।

সারাজীবন সে কারুর কাছ থেকে এতটুকু স্নেহ মমতা সোহাগ পায নি। শৈশবে মা বাবার স্নেহকে বুঝতে পারে নি। বয়স বাড়তে বুঝেছিল, সেই স্নেহের আডালে কি জঘন্য ষডযন্ত্র লুকিয়ে ছিল। তাই রসিকের কথায, রসিকের আহ্বানে ওর বুকটা আবেগে ফুলে ফুলে উঠছিল। ঐ জীবনের প্রতি একটা লোভ, একটা ব্যাকুলতা ক্রমশ মাথা চাডা দিচ্ছিল কিন্তু নযন সেই লোভকে আর বাডতে দিল না। ওর ভেতর থেকে কে যেন খন খন মাথা নাডছিল, না না, এ হয় না, এ হতে নেই।

রসিক হয়তো সত্যিই তাকে ভালোবেসেছে, তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার তার সত্যিকারের তাগিদ, কিন্তু সে কোন্ লজ্জায় তার নিজের কুরে খাওয়া শরীরটা নিয়ে রসিকের ভালোবাসার কাছে দাঁডাবে? রসিক না মানুক, সমস্ত লোক, সমাজ আঙুল তুলে দেখাবে— ঐ যে বেবুশ্যেটো, ঝুমুরের রাণী, হাজার মানুষের গিলে খাওয়া মেয়েলোক—ওকে লিয়েই রসিকের সংসার, রসিকের পীরিত। তার নিজের কিছু হয় না, শুনে শুনে সহ্য হয়ে গেছে কিন্তু তার জন্যে রসিকের বদনাম হবে, রসিককে সবাই দুষবে, এ তো হতে পারে না।

রসিক তাকে ভালোবাসে—এটাই তার অভিশপ্ত জীবনের মস্ত সান্ত্বনা, এর বেশী সে চায় না। রসিকের ভালোবাসা তার সব দুঃখ গ্লানি যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিয়েছে। সারাজীবন তার ঐ সুখে কাটবে কিন্তু নিজের লোভের জন্য, নিজের সাধের জন্য রসিকের জীবন সে ব্যর্থ করে দেবে না। প্রথম প্রথম কষ্ট হলেও রসিকের একদিন সব সহ্য হয়ে যাবে। সব মানুষেরই হয়। তখন সে বিয়ে করবে, বউ আনবে, সুখী হবে।

মনে মনে নয়ন নিজেকে শক্ত করে নেয়, মনস্থির করে ফেলে।

নয়নের কান্না থেমে এসেছিল। ও রসিকের বিশাল বুকটা নখ দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে বলল, লাগর, ত্যালে তুমি সত্যিই বিহ্যা করতি চাও? তুমি সমাজ মানো না, ধম্মো মানো না, সব মানলেম কিন্তু দিন গ্যাযে দু'মুঠো তো খেতি লাগবে—তা জুটবে কুথা থেকি? তুমার তো জমি জিরেত তেমুন নাই। লষ্টা ম্যাইয়াকে লিয়ে ঘর করলি কেহু তুমায় কাম দিবে না। তখুন কি না খায়ি শুখায়ি মরবে?

রসিক এ দিকটা অত ভেবে দেখেনি। নয়নকে নিয়ে সে সুখে ঘর বাঁধতে চায়। ওকে যদি খেতে পরতে না দিতে পারল তাহলে আর সুখ কই? তবু তার পৌরুষ মাথা হেঁট করল না। বলল, কেনে, তুর কি বিশ্বেস নাই? আমি কি জুয়ান মরদ লই? মুনিষের কাম ঠিক জুট্যা যাবে। তু ই ভাবিস নে।

তারপর একটু আবেগ নিয়ে বলল, উ সব কিছু লয়, শুন্ আমি গানের দল তোয়ের করব। আমি সাধন মাঝির জুটি, বায়না মিলতে দেরী হবে না। তখুন দেখবি টাকার আর কুনো কষ্ট থাকবে না।

রসিকের কথা শুনে নয়ন খিল খিল করে হেসে উঠল, লাগর, তুমি পাগল হইছ? গানে কখুন পয়সা হয়? দেখছ না, আমরা লেচে গেয়ে কেমুন পয়সা কামাচ্ছি? ই তো লাচের দাম লয়, ইজ্জতের দাম। শুনো, তুমার মতুন পাগল হওয়ার সখ আমার নাই। উখানে গিয়া শুখায়ি মরতি পারব না। যদি পয়সা হয় তখুন এসো, বাঁচি থাকলে না হয় বিহ্যা হবে, সংসার পাতা যাবে।

নয়নের কথাগুলো রসিকের পৌরুষে লাগল। সে নিজের বউকে খাওয়াতে পারবে না? রসিক কিছু না বলে ছিটে বেড়ার ফাঁকে রোদের আলোয় মুখ ফিরিয়ে নিল।

ওদিকে মেলা জেগে ওঠার কোলাহলও আস্তে আস্তে স্পষ্ট হচ্ছিল। রসিক চুপচাপ শুয়ে শুয়ে আপন মনে নানান্ কথা ভাবতে লাগল।

লাগর, তুমি আগ করলে? দেখো, দুজনার ভালোর জন্যিই উ সব কথা পাড়লাম।

রসিক ওকে বাধা দিয়ে বলল, আগ করার কি আছে, তু তো ন্যায্য কথাই বুলেছিস। তা শুন্, এখুনই আমি চললেম, পয়সা না করি ফিরছি না।

রসিক উঠে দাঁড়াতেই নয়ন ওর হাতটা ধরে ফেলল, আমার মাথা খাও লাগর, এখুনই চলি যেও না। তুমার দুবলা শরীল, ক'দিন আরাম করি লাও, তাপর যাতি হয় যেও, কেহু বাধা দিবে না।

রসিক বসতে বসতে বলল, না, আমি আর থাকব না, আমার মুন টানছে, আমি গানের দল তোয়ের করব। পয়সা আমার চাইই চাই, তু আর বাধা দিস্ নে, আমি ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় পাড়ি দিই।

নয়ন তেমনি ভাবেই হাত ধরে বলল, লাগর, এই ঠাণ্ডায় যেও না, পথে কুথায় কি হয়ে পড়ি থাকবে। বরং শরীলটা আব একটু সামলাক, তখুন যেও।

লয়ন, তু আর বাধা দিস্নে। এতটা কাল কুথাও আমাব পিছটান ছেল না, খ্যাযে তুর কাছে বাঁধা পড়ে গেলুম। ইখুন আমাকে একাই ফিরতে হচ্ছে, কিন্তু পযসা হোক তখুন আর ফিরব না। যদ্দিন না পয়সা হচ্ছে তদ্দিন সুখ নাই। আমি উই আলকাপ দল করেই পয়সা করব। তুই ঝাঁকসু মাঝি, সুলতান, লম্বোদর-গোমানি দলের নাম শুনিস্নি, উয়াদের তো গানেই নাম-ডাক, গানেই জমিজিরেত। তু দেখিস্, ফিরে মেলায় তুকে আর আসতি হবে না, তার আগেই বেবস্থা কর‍্যা ফেলব। ইখুন তু আমায় যেতি দে।

নয়ন ওর হাতটা আবো আঁকড়ে ধরে বলল, লাগর, তুমি যখুন যাবেই তুমায় আর আটকাব না। কিন্তু একটা কথা রাখো, তুমি ই বেলায় থেকে যাও, এই সক্কালে যেও না, তালে বড় কষ্ট পাব। আজ তুমার বেরামি শরীলটা সুস্থ হইছে, ই বেলাটা আমার কাছে থাক, উ বেলায় আব কিছু বুলব না।

নয়নের ঐ আকুল অনুরোধ ঠেলে বসিক যেতে পারল না। রসিক ওর ঝোলাঝম্প নামাল।

নয়নের অমন কান্না কান্না চোখ-মুখ দেখে একটু হেসে বলল, তু একদম আহুরে বউটির মতুন গোঁসা করতি লেগেছিস। এখুন ঘটি গামছা দে, বেলা অনেকটা হল।

রসিক গামছা কাঁধে একটা পিঁটুলির ডাল দাঁতে ঘষতে ঘষতে মাঠের দিকে গেল।

ওদিকে বেলাও বাড়তে শুরু করেছে। নয়নকে উঠতে হল। বিছানা ঝাড়তে গিয়ে ওর গত রাত্রের কথা মনে পড়ছিল। সারারাত ঐ মানুষটার বিরাট লোমশ বুকটায় মেনি বিড়ালের মতো মুখ গুঁজে ঘুমিয়েছে। মানুষটা ভালোবেসে তার কপালে, গালে, মুখে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিয়েছে। ঠাণ্ডায় যাতে সে কষ্ট না পায় তাই তার গরম বুকে নয়নকে জড়িয়ে নিয়েছে। অথচ মানুষটা বেখেয়াল হয়নি। ঝুমুরীদের আবার ইজ্জত, তবু মানুষটা ভুল করেও ভিন্ন জায়গায় হাত দেয়নি।

রসিকের শরীরে উত্তাপ ছিল কিন্তু উত্তেজনা ছিল না, রসিকের আলিঙ্গনে আবেগ ছিল স্নেহ ছিল ভালোবাসা ছিল, কিন্তু কামনা ছিল না। নয়ন ঝুমুরী অবাক হয়েছে, এমনধারা মানুষ ও আর কখনো দেখে নি। তাই সারারাতের কথা ভেবে ও পুলকিত হচ্ছিল। ওর হাজার মানুষের কুরে খাওয়া শরীরটাও সুখে শিরশির করে উঠছিল। ওর মুখ-চোখে কিছু আবেশ কিছু অনুরাগ ঘন হচ্ছিল। নয়ন বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে একটু উন্মনা হয়ে পড়ছিল।

রসিক ফিরতে ফিরতে নয়নের বিছানা তোলা, ঘর পরিষ্কার করা, নিজের মুখ হাত ধোয়া, অন্যান্য কাজ সারা হয়ে গেল। অন্য ঘরের মেয়েদের এখনও ওঠার সময় হয় নি। নয়নও উঠত না। সারারাত নেচে সারাদিন না ঘুমালে সারারাত আর শরীর চলে না।

আজ নয়নের সবই উল্টো। রসিক ও বেলায় চলে যাবে। নয়নের সঙ্গে আর হয়তো কখনো দেখাই হবে না তাই নয়নের চোখে ঘুম নেই। শরীরে যাতে না ক্লান্তি নামে সেজন্য সে মেলার তালপুকুর থেকে একেবারে চান সেরে এলো। ওর বুকে আপনা থেকেই দু-এক কলি গান গুণগুণিয়ে উঠল।

রসিক অল্পক্ষণ পরেই ফিরে এলো। নয়ন খুব আদুরে গলায় ওকে দোকান থেকে দু'আনার চা আনতে বলল। চা খাওয়ার শখ ওর নিজের খুব একটা নেই, আজ কিন্তু সব কিছুতেই ওর খুশি ফুটছিল।

চা খেতে খেতে দুজনে মুখোমুখি বসেছে। টুকরো হাসি ঠাট্টায় দুজনেই মেতে উঠেছে, কখনো ভিন্ন কথায় অনুরাগ কি অভিমান ফুটছিল।

রসিক নিজের কথার এক ফাঁকে নয়নের বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করল।

নয়ন সেই আগের মতোই ঠাট্টার সুরে বলল, কেন গো লাগর, আর বুঝি ই মানুষটিকে পসন্দ হচ্ছে না? বাড়ির খবরে কাজ কি? শেষে তার গলাটা ভারী হয়ে এলো, লাগর, আমাদের আবার বাড়িঘর!

রসিক একটু সান্ত্বনা দেবার মতো সুরে বলল, না না, তুর ছোট্টবেলার গল্প বুল। তুর সিই বাগানে বাগানে ঘুরে বেড়ানো, ফুল চুরি ফল চুরি করা, ঘুটিংকড়ি খেলা—ই রকম সব গল্প। ছোট্‌বেলার গল্পে কেমুন টান আছে, কেমুন খেলি বেড়ানো, হৈ চৈ করা, কুনো কাম নাই, কুনো ভাবনা নাই। তুর তেমুন সব গল্প বুল, আমার খুব ভালো লাগবে।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে নয়ন ছোট্ট কিশোরীর মতো ছটফটিয়ে ওঠে। ওর মনটা এই বৈরেগীতলার আকাশ পেরিয়ে অনেক দূর সাঁইথিয়া ছাড়িয়ে ভাবঘাঁটি গাঁয়ে ছোট ছোট চালার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়।

একটু দূরে কেঁদুরের ছিরছির জল, ওপারে হিজল বাঁটুলের জঙ্গল, চাঁইদের বসতি, তার শৈশবকালের পরিচিত সব জায়গাগুলো সে খুঁজে বেড়ায়।

অর্জুনতলার ভাটিখানা থেকে ডুগডুগীর বোল, ঢোলকের তাল, নানান্ মেয়ে-মিন্‌সের গান গলা—এই সব বিচিত্র শব্দের সঙ্গে পেঁয়াজি ফুলুরি ভাজার গন্ধ, মদ তাড়ির গন্ধ, পচুইয়ের গন্ধ, মেয়ে মিন্‌সের গতরের গন্ধ, তাদের নাচের তালে তালে বন বাদাড়ের গন্ধ ওর নাকে এসে লাগে, নয়ন ছোটবেলার রাজপুরীতে হারিয়ে যায়।

ভাবঘাঁটি গ্রামটা একটা ডাঙার ওপর। চতুর্দিকে তাল, নারকেল, খেজুরের সারি। কেঁদুরের ওপাশটা জংলা জংলা। হিজল, বওলা, ভাঁটের জঙ্গল। মনিকাঁটা, শ্যাওড়া, মেহেদির জঙ্গল। দিনের বেলায় শেয়াল, প্যাচার ডাক শোনা যায়। রাঢ়ের খরায় ওখানে কেমন শীতল শীতল, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া। ওখানে গেলেই রোদে-জ্বলা দিনরাত্রির জগত থেকে ভিন্ন জগতে, ছায়া ছায়া, খট্টাস, গুঁইসাপ, গিরগিটি ডাকা জগতে নিজেকে ভিন্ন মানুষ মনে হয়। ওখানে চোখ রাঙাবার, গালমন্দ করবার, না না করবার কেউ নেই। ওখানে নিরিবিলিতে ঘর সংসার পেতে সুখ। ওখানে নিজেকে আর কিছু ভেবে সুখ।

নয়ন সেই কচি বয়স থেকেই ওই গাছগাছালির রাজ্যে ছুটত। এক বাঁশের সাঁকোটা কেমন দ্রুত, কেমন খেলার ছলে পেরিয়ে মোথা ঘাস মাড়িয়ে হিজল মেহেদি জঙ্গলটার দিকে ছুটত। সকালে ছুটো চালভাজা, ভিজে ভাত যা জুটল মুখে দিয়েই ছোটার তাড়া পড়ে যেত।

আশশ্যাওড়ার ঝোপের ধারে দূর্বাঘাসের কোলে নয়নের খেলাঘর। নয়ন কামরাঙা গুঁড়ির চারধার নিকিয়ে ঘরকন্না নিয়ে বসত। রোদ বাড়তে বাড়তে কদম, রাঙি, ময়না, পরান, সূয্য, পতিত ওরা সব্বাই ছুটে ছুটে আসত। হিজল মেহেদির জঙ্গল ওদের খিলখিল হাসি, গান, খেলায় ভরে উঠত। ভাঁট, মাদার, গুলঞ্চ ফুলে পাগল প্রজাপতি, মৌমাছি, ভোমরার সুরের সঙ্গে তাদের হাসি, গান, খুশি একাকার হয়ে যেত।

পবন, পতিত, সূয্য ওরা খুঁজে খুঁজে বঁইচি, শিয়ালকুল, টেপুরা, ফলসা কচুপাতা, পদ্মপাতা তুলে আনত আর নয়ন, কদম, রাঙি ওরা বসে বসে বাটনা বাটত, কুটনো কুটত, ওদের খেলাঘরের ঘরকন্না শুরু হোত।

এই সব গরীব ঝুমুরীদের ছেলেমেয়েদের ঐ বয়সে কাপড় চোপড় পরার চল নেই। আর্থিক অনটনের জন্যেই অনেকে বেশী বয়স পর্যন্তও কাপড় পরত না। একটু ডাগর বয়সে মেয়েরা আদুড় গায়ে ঘুরত, পরনে এক চিল্‌তে ছেঁড়া কানি আর ছেলেদের কোমরের ডোরে গোঁজা ল্যাঙট।

নয়নদের ও সব নিয়ে ভাবনা ছিল না। কচি বয়সে কচি পাতার জঙ্গলে ওরা নির্মল শিশুর মতো ছোটাছুটি করত। সেই বনবাদাড়ে, পাখপাখালি ডাকা ছায়া, ছায়া বনফুলের আওতায় তাদের নগ্ন শরীর অপূর্ব ভাবে মানিয়ে যেত। কোন লাজলজ্জা নেই, কেউ এ নিয়ে ভ্রুকুটি করার নেই, ঐ পরিবেশে সব যেন একান্ত স্বাভাবিক মনে হোত।

এই মেহেদি, মাদার, ভাঁটের জঙ্গলে যারা খেলতে আসত তাদের সকলের এক বয়স, এক বেশ। কোমরে একটা লাল কি কালো ডোর বাঁধা। সেই ডোরে কারুর একটা তামার পয়সা, কারুর মাদুলি, কারুর হাড় বাঁধা। নয়নের কোমরের লালডোরে একটা বাদুড়ের ঠোঁট গাঁথা ছিল। আর নাভির ঠিক নিচে যেখান থেকে তলপেট ঢালু হয়ে নেমে গেছে সেখানে রঙিন সুতোয় দুটো সিসের বল বাঁধা থাকত। নয়ন যখন হুড়োহুড়ি কিংবা ছুটোছুটি করত তখন সে-দুটো টুং টুং করে বাজত।

সেই কচি বয়স থেকেই তার শরীরটা কেমন ঝিলিক্ দিত। বউ বউ খেলায় তাকে বউ করার জন্যে সেই অতি শৈশব থেকেই কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। কখনো পরান, সূয্যি, পতিতের মধ্যে ঘুষোঘুষি হোত, শেষে পালা করে নয়ন তাদের বউ সাজত। যেদিন যার ভাগ্যে নয়ন জুটত, সেদিন তার আর খুশি ধরত না। সেদিন তাকে ভীষণ গর্বিত, উদ্ধত আর দুর্বিনীত মনে হোত। সেদিনকার

মতো সে নয়নের খিলখিল হাসি আর কোমরের ডোরের টুং টুং শব্দের মালিক হয়ে যেত।

হিজল মেহেদি জঙ্গলে সারাদিন কাটিয়ে রোদ পড়তে পড়তে ওরা ঘরে ফিরত। তেমনি ছুটতে ছুটতে, খেলতে খেলতে সাঁকো পেরিয়ে ওরা গাঁয়ে ফিরত।

ঘরে ফিরে নয়নের আর একটুও ভালো লাগত না। সেই টিনের চাল আর খলপার বেড়া দেওয়া ঘর। একটু হাওয়া উঠলেই মচমচ করে ঘরের চালে, দেওয়ালে শব্দ ওঠে। ধুলোয় তার চোখ মুখ শরীর ভরে যায়।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে দাওয়ায় মা মাসির উকুন মারার শব্দ, তাদের খুশি নজরে পড়ত। ওর আর ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করত না। ও গোঁড়া লেবুগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে নখ খুঁটত কিংবা পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটিতে দাগ কাটত।

সেই ছোটকাল থেকেই তার কেমন এক বার টান জন্মেছিল। ঘরে মন বসে না। খালি ছুটে ছুটে বাইরে যেতে মন চায়। কাঠবিড়ালী, গিরগিটি, চিকন বাছুরের পিছনে ছোটাছুটি করতে মন চায়। গাঙফড়িঙের পিড়িং পিড়িং উড়ে বেড়ানো, প্রজাপতির পিট পিট ফুল ছোঁওয়া, ভোমরার বোঁ ভর্‌র্‌র্ ডাক— সব কিছু নয়নকে টানে। ডাহুকের একটানা ডুক ডুক ডুক ডাক, ঘুঘুর থেমে থেমে ঘু ঘুর্‌র্‌র্ ঘু ডাক, বকেদের কাওয়া কাওয়া ডাক ওকে কেমন উদাস করে দেয়। ও কেমন সব ভুলে ঐ সব ডাক, সাড়া-শব্দে তলিয়ে যায়। ঘরে থাকতে থাকতে ওর মন সেই কেঁদুরের ধারে বওলা, হিজল, ফলসার আওতায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

কতদিন ঘুম ভেঙে, ভর নিশীথে, ও দাওয়ায় বসে কুপ্‌ পাখির ডাক শুনেছে, গা ছম্ ছম করে উঠলেও রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় এক টানা কুপ কুপ কুপ ডাক শুনেছে। শুনে কেমন বিবশ হয়েছে।

কতদিন রাত জেগে হীরামন পাখির ডাক শোনার আশায় ঠায় বসে থাকত। রাতের বিচিত্র ধ্বনি প্রতিধ্বনির মধ্যে কোনদিন হীরামন পাখির ডাক শুনতে পেলে ওর আর খুশি ধরত না। ও সেই বয়সেই খুশির চেহারাটা বুঝতে শিখেছিল। ওর বুকটা ভরে উঠত। ও ঘরে ঢুকে ঘুমে জড়ো মাকে জড়িয়ে ধরে, মার বুকে সুখ কাড়তে কাড়তে ঘুমিয়ে পড়ত।

এই ছুট্‌ ছুট্‌ মন নিয়ে, খেয়াল নিয়ে নয়নের দিন কাটত। ওর ঘরে মন বসত না, ঘরে টিকতে পারত না, ওর বুকে কেবলই কিসের এক সাড়া জাগত, কি এক সুখের কলকলানি, নয়ন সেই বয়স থেকেই ভিন্ন তৃপ্তির সাধ পেয়েছিল।

ওদের ওই খুপরির মতো ঘরটায় ও, ওর মা আর বাবা থাকত। কিন্তু ঐ মানুষটাকে ওর বাবা বলে মনে হোত না। রাতে রস খেয়ে মাতাল হয়ে ঘরে ফিরত। আর ফিরে প্রথমেই ওর মাকে টেনে তুলত আর হ্যাঁচকা টানে কোমরের ফাঁসটা খুলে ফেলে জাপটে ধরে খিস্তি করত।

নয়নের মা সুহাগীর কোমরের কালোডোরের গিঁটে বাঁধা পুঁতিগুলো ঝিক মিকিয়ে উঠত। মানুষটার মুখ দিয়ে ভক ভক করে তাড়ির গন্ধ বেরুত। তার খাবলা খাবলি, কামড়া কামড়িতে সুহাগীর সারা গায়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত ফুটে বেরোত আর সরু সরু নখের চেরা দাগ পড়ত। মা ওর সঙ্গে গড়াগড়ি দিয়ে নিজেকে ছাড়াতে চাইত, শেষে না পেরে হার স্বীকার করত, তখন শুরু হোত মাতালের বিকার।

কোন কোন দিন নেশার ঘোরে মানুষটা জোর করে সুহাগীকে জাপটে ধরতে গিয়ে মেঝে কিংবা বেড়ায় ছিটকে পড়ত। ওর কপাল, ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরত। আবার কোন কোন দিন নেশার জের সামলাতে না পেরে সুহাগীর গায়ে মুখে গল গল করে বমি করে ফেলত। তখন সমস্ত ঘর টক টক গন্ধে ভরে যেত, নয়নের গা পাক দিয়ে উঠত। তাই ঐ মানুষটাকে নয়ন কখনো বাপ বলে মানতে পারে নি, মানতে চায় নি। সুহাগীও কোনদিন এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করে নি।

অনেক দিন দেখেছে, ওর বাপের বদলে অন্য কোন মানুষ সুহাগীকে নিয়ে শুয়েছে। কামড়া কামড়ি না হলেও দেখেছে মানুষগুলোর মাতলামি। নয়ন কিন্তু কোনদিন এ নিয়ে সুহাগীর মুখে কোন আক্ষেপ শোনে নি। বরং রাতে যেদিন ওর মা বাইরে যেত সেই দিন গায়ে ঘষে ঘষে গন্ধ সাবান মাখত, নকশা-পাড় লাল ডুরে শাড়ি পরত আর গুণ গুণ করে গান করত। পিছন থেকে সুহাগীর দোদুল হাঁটা দেখে ওর গা'টা কেমন করে উঠত, ওর মার শরীরটা দুলত, কাঁপত, কোমরটা থলথল করত।

শেষ রাতে যখন ফিরত তখন ওর মার শরীরে মুখে রসের গন্ধ। মার পা টলত, চোখ ঝিমাত। নিশ্বাসটা ভারী হয়ে যেত। ওর মা চাটাইয়ে গড়িয়ে পড়ত। তখন মার জন্যে নয়নের ভারী কষ্ট হোত, মাকে অমন ভাবে শুয়ে পড়তে দেখে ওর কান্না পেত।

নয়ন মাকে ভালোবাসত খুব। রাতে অত যে অত্যাচার সইত, শরীরের ওপর দিয়ে অত যে ঝড় বয়ে যেত, দিনে তার কোন চিহ্ন থাকত না। সকাল হলেই উঠে ঘর ঝাঁটানো, উঠান নিকানোর পাঠ সেরে নয়নকে ডাকত।

সুহাগীর আদরেই ছোট থেকে নয়ন একটু আহ্লাদী হয়ে উঠেছিল। মা ডাকত আর ও ঘাপটি মেরে পড়ে থাকত। সুহাগী যখন গজগজ করতে করতে এসে ওকে ধাক্কা দিত তখন হঠাৎ উঠে মাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ও মার বুক মুখ ঘষত। মার শরীরে তখন ভোরের হাওয়ার মাটি মাটি গন্ধ।

সুহাগী একটু কপট রাগ করত, ইস্, মেলা বেলা হুইঙ গেল তবু ই ম্যাইয়ের ঘুম ছুটে না। বড়টি তো কম হস্‌নি, এখুনও মাকে জড়ায়ে ঘুমাস্, লুকে কি বুলবে? তারপর নয়নের গালটা টিপে দিয়ে বলত, উঠ সোনা, কতটি বেলা হুইঙ গেল, ঘরের কত কাজ বাকী, ইবার উঠে পড।

নয়ন তবু উঠত না। মার তুলতুল বুকটায় মুখ ঢেকে বড় সুখ, কেমন গরম গরম আওতা, মেঠো মেঠো বাস, নিশ্বাসের তালে তালে বুকটা ওর নাক, মুখ, ঠোঁট ছুঁতো। নয়ন মাকে তেমনি ভাবে জড়িয়ে শুয়ে থাকত।

সুহাগী ওর দুষ্টুমি বুঝতে পারত, ভালোও লাগত। তার নিঃস্ব জীবনটায় নয়নই একমাত্র আশ্রয়। নয়নকে নিয়েই ওর সুখ, শান্তি। নয়নের মুখের দিকে তাকালে ওর সেই মানুষটির কথা মনে পড়ে, তার মুখটা চোখে ভাসে।

সুহাগীর তখন কতই বা বয়স। অনেকের ঐ বয়সেই বউনি হয়ে যায়, বউনি করে মেলায় মেলায় ঘোরে। সুহাগীর মা কিন্তু তাকে ঐ বয়সেই ছাড়ে নি, কারণ তখন তার নিজের জমাটি ব্যবসা, যৌবনভরা শরীর। সুহাগীকে আরো একটু শক্ত পোক্ত করে তুলতে চেয়েছিল। শরীরে তাগদ থাকলে ঢের দিন ধকল সইতে পারবে, পয়সা কামাতে পারবে। অল্প বয়সে নামলে অল্প দিনেই দেহের ভাঁজে ভাঁজে দাগ পড়ে, মুখে চটা পড়ে, বুকে ঢল নামে। ওর মার অত চিন্তা ভাবনা সত্ত্বেও সুহাগীর কেমন অদ্ভুত ভাবে বউনি হল। সে কথা ভাবলে আজো তার চোখে মুখে রঙ ধরে।

ডাকবাঙলোয় এক বাবু এসেছে। ঝুমুরীদের সব খবর-টবর নিয়ে বেড়াচ্ছে। একে ওকে ডেকে গল্প করে, এর ওর বাড়ি খোঁজ নেয়। কারা যেন বলেছিল, ও বাবুর না কি খুব নাম-ডাক, বই-টই লেখে। সুহাগীর ও সব নিয়ে অত ভাবনা ছিল না, কারণ তার সঙ্গে বাবুর কোন কাজ নেই। দূর থেকে এক আধবার দেখেছে, ব্যস ঐ পর্যন্ত।

সেদিন উঠানে দাঁড়িয়ে স্থহাগী ভিজে কাপড়ে চুল ঝাড়ছিল। হঠাৎ দেখে বাবুটি তাদের লেবুগাছটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। স্থহাগী একটু অবাক হলেও ব্যস্ত হয়ে পড়ে নি, যেমন চুল ঝাড়ছিল তেমনি ভাবে চুল ঝেড়ে গামছা দিয়ে বিনুনির মতো মুড়ে দাওয়ায় উঠতে গিয়ে হঠাৎ বাবুর চোখে চোখ পড়তে নিজের শরীরে লক্ষ্য পড়ল। তার কুমারী শরীরে ভিজে কাপড় জড়ানো থাকলেও চুল ঝাড়ার সময় শরীরের কোন অংশ ঢাকা থাকেনি। জীবনে প্রথম পরপুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টি চিনতে পেরে স্থহাগীর বুকটা থর থর কেঁপে উঠল, চোখের পাতা ঘন হল। দাওয়ায় উঠতে উঠতে ফিরে তাকিয়ে দেখল, তেমনি ভাবেই তাকিয়ে আছে বাবুটি।

ঘর থেকে কাপড় পাল্টে এসে দেখে, বাবু দাওয়ার ওপর এসে বসেছে। ওকে বেরিয়ে আসতে দেখে একটু হেসে বলল, এটা তো কমলির ঘর, না?

স্থহাগী একটা চাটাই পেতে বলল, মাটিতে বসে আছেন কেনে, ইটায় বসেন। একটু থেমে বলল, মা তো নাই, দল লিয়ে গেছে ভাবতা।

তোমার মা-ই তো দলের নেতা, না? কবে ফিরবে?

তাব তো কুনো ঠিক নাই, দু'দিনের বায়না লিয়ে গেছে। উখানে বায়না জুটলে সেটিও সেরে আসবে। ইখুন তো মেলা নাই, তাই গাঁয়ে গাঁয়ে বিহ্যা সাধি, এমনি পালায় বায়না লিতে হয়।

তোমার নাম কি?

স্থহাগী মুখটা নিচু করে বলল, স্থহাগী।

স্থহাগী, বাঃ বেশ নাম তো। তোমাকে দেখতেও বড় স্থহাগী, বেশ মিষ্টি নাম তোমার। আচ্ছা স্থহাগী, তোমার মা তো দল নিয়ে গেছে, তুমি এখানে একলা একলা কি কর?

কেনে, আন্না বান্না, ঘর লিকানো, খার কাচা, পিয়ারা কুল পাড়া, ঘাসবনে ছুটোছুটি—কত কি করি।

লোকটির অমন হাসি হাসি চোখ মুখ আর খুঁটে খুঁটে ওদের সব কিছু জানার আগ্রহ দেখে স্থহাগীর বেশ মজা লাগছিল। ওর পাশে দাওয়ায় বসে পা দোলাতে দোলাতে অনেক কথা বলছিল। লোকটার অজ্ঞতা দেখে মাঝে মাঝে হেসে গড়িয়ে পড়ছিল সে, আবার মাঝে মাঝে মুখনাড়াও দিচ্ছিল—লোকটাও কেমন বোকার মতো হেসে শুনছিল, কখনো একটু ঠাট্টা করছিল, আবার তাকে রাগাবার জন্যে এটা ওটা বলছিল।

এই ভাবেই লোকটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। দু'দিন পরে লোকটা যখন হাত ধরে টেনে ওকে আদর করেছিল, সুহাগী তখন বাধা দেয় নি। ওর কেমন যেন ভালো লাগছিল। ঐদিনই তার কুমারী মনে মানুষটার গভীর ছাপ পড়ে গিয়েছিল।

লোকটার আদর নিতে নিতে সুহাগী ওকে ঝুমুরীদের অনেক ঘনিষ্ঠ কথা, তাদের জীবনের সুখ দুঃখের কথা একটু একটু করে শুনিয়েছিল। বলেছিল, শীতের ক'মাসই ঝুমুর গানের মরশুম। ওতে যা আয় হয় সারা বছর তাতে চলে না, তাই ঘরে ফিরেও বাঁশ চেঁছে ধামা কুলো বোনে, হাটে হাটে বিক্রী করে দিন চালায়। কিন্তু তাতেও তেমন কিছু জোটে না, তাই দল ছেড়ে অনেকেই শহরে পালিয়ে যায় আর ফিরে আসে না।

ও আরো অনেক কথা বলেছিল, বছরের বাকী কয়মাসের জীবনের কথা। দলের যারা বাজিয়ে তাদের নিয়ে ঝুমুরীরা ঘর বাঁধে। খেলার সাথীরাই শেষ পর্যন্ত মেয়েদের পুরুষ হয়, তাই খুঁজলে পরস্পরের মধ্যে রক্তের সম্পর্কও পাওয়া যেতে পারে।

এই রকম নানান্ গল্প করতে করতে সুহাগী বাবুটিকে নাচ দেখায়, গান শোনায় আর মানুষটা খাতায় কি সব লিখে নেয়। সুহাগীর গালটা নেড়ে দিয়ে বলে, তোদের কথা আমি লিখব, তোদের কথা আর সবাই জানবে।

একদিন এমনি গল্পে গল্পে সন্ধ্যা হয়ে এলো। বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। এই সময় একটু জোরে এলো। দরজা, জানালা দিয়ে ছাট আসছিল। চালা ঘরটায় বৃষ্টির কেমন একটা ঝিপঝিপ শব্দ উঠছিল। সুহাগী দরজাটা বন্ধ করে জানালাটা একটু ভেজিয়ে দিল।

ঘরটা অন্ধকার অন্ধকার। লোকটার কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে নিয়ে সুহাগী কাঁচভাঙা লণ্ঠনটাই জ্বালাল। বাইরে বৃষ্টির শব্দ, গাছগাছালিতে টুপটাপ শব্দ, চালের ঝিপঝিপ শব্দ। গল্প আর তেমন জমছিল না। লোকটা প্রায়ই থেকে থেকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল।

সুহাগীর বুকেও বাইরের বৃষ্টির মতো ঝিরঝির শব্দ শুরু হয়েছিল। এমন রাতে লোকটার কাছে বসে থাকতে কেমন যেন ভালো লাগছিল।

সুহাগীর অমন ভালো-লাগার মধ্যেই হঠাৎ লোকটা দু'হাতে তাকে নিজের কাছে টেনে নিল।

সুহাগী তাকিয়ে দেখে লোকটির মুখে কৌতুক ফুটে উঠেছে, চোখে মিনতি।

সুহাগী একটু ইতস্তত করেছিল। তারপর সেই ঝিরঝির বৃষ্টি, চালের ঝিপঝিপ শব্দের মধ্য দিয়ে সুহাগীর শরীর সুখে খুশিতে ছটফটিয়ে উঠেছিল। নেশার মতো তার শরীরে ঘোর লেগেছিল। লোকটার শরীরে সুহাগী একটু একটু করে তলিয়ে গিয়েছিল।

সেই বৃষ্টির রাতে মনের মানুষের বুকে শুয়ে সুখ কাড়তে কাড়তে হারিয়ে যাওয়ার কথা ও কোনদিন ভুলতে পারবে না। তার সেই কুমারী বয়সের সুখ সাধ নিয়েই একদিন নয়ন এলো। তাই সুহাগী নয়নকে আড়াল করতে পারে না। নয়নের মুখের দিকে তাকালেই সেই মানুষটিকে মনে পড়ে যায়।

ভোরবেলায় নয়নকে দুষ্টুমি করতে দেখে সুহাগীর ভালো লাগে। নয়নের ঘামে ভেজা চোখ-মুখে হাত বুলিয়ে দেয়, দু'হাতে মুখটা ধরে আদর করে চুমু খায়। তারপর বলে, এখুনও উঠলি না তো, গ্যাখ যেয়ে কদম, রাণ্ডিরা কখুন হিজল বুনে চলি গেছে। তুর সেই কামরাঙা গাছে আজ আর খেলতি হবে না, আগুতেই উরা দখল করি লিবে।

নয়নকে আর কিছু বলতে হয় না, ও লাফিয়ে উঠে পড়ে। মুখটা ধুয়ে, মুখে কিছু দিয়েই ছুট।

সুহাগী চেঁচাতে থাকে, অরে যাস্ নে, খেয়ে যা, উরা এখুনও যায় নাই।

কিন্তু সুহাগীর কথা শোনার জন্যে তখন নয়ন দাঁড়িয়ে থাকে না।

নয়নের গতিপথের দিকে তাকিয়ে সুহাগী হাসে, আর মনে মনে বলে, একেবারে পাগলি।

যতদিন বাড়ি থাকে নয়নকে নিয়েই সুহাগী ব্যস্ত। ও আর মা থাকে না, ছোট্ট কিশোরীর মতো ও নয়নের সঙ্গে গল্প করে, খুনশুটি করে, ওদের মধ্যে মান অভিমানের পালা চলে। মার কাছে নয়নের যত আব্দার, যত সুখ দুখের কথা। দুজন দুজনকে ঘিরে একটা আপন জগত তৈরি করে নিয়েছে। তাই রাতের অত অত্যাচার, অত পীড়ন দেখে মার জন্যে ওর খুব কষ্ট হোত। মার পাশে পাশে থেকে সেই দুঃখ-কষ্ট বুঝতে চেষ্টা করত।

সুহাগী নয়নকে ঘিরে নিজের সুখ সাধ মেটাতে চেষ্টা করত আর নয়ন তার সঙ্গ দিয়ে, তার আব্দারে আব্দারে সুহাগীর কষ্ট দূর করত।

নয়ন বুঝত মাকে কি বলে রাগিয়ে সুখ, কি কথায় মার রাগ ভাঙে। ভারী বয়সেও কতদিন নয়ন মাকে জড়িয়ে, মার বুকে মুখ ঘষে মার রাগ ভাঙিয়েছে। কতদিন মেলা ঘুরে মার জন্যে বাস তেল, কাঁচপোকার টিপ, রঙিন চুড়ি নিয়ে গেছে। মার গা ঘেঁষে পা ছড়িয়ে মাকে সাজিয়েছে, আলতা টিপ চুড়ি পরিয়ে রস করেছে, নিজের ফিনফিনে শাড়ি ব্লাউজ পরিয়ে ঠোঁট কেটে হেসেছে, ইস্, তুকে কি সোন্দর লাগচে, ঠিক সি সিনমার লায়িকার মতু।

সুহাগী কপট রাগ দেখিয়েছে, ইস্ মেলা ঘুরি ঘুরি তুর স্বভাব বড় খারাপ হইঙ গেচে, মার সাথি রঙ করিস—মুখে ঝাঁজ দেখালেও নয়নের আদরে সুহাগী তৃপ্তি পায় তাই শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে রাখতে পারে না, নয়নের সঙ্গে হাসি হুল্লোড়ে মেতে ওঠে।

সেই শৈশবকাল থেকেই নয়ন মাকে চিনেছিল নিজের একান্ত সখী রূপে। মার কাছেই তার যত আব্দার, মার সঙ্গেই তার যত মান অভিমান, যত সুখ দুঃখের গল্প।

বয়সকালে এসেও তার কোন পরিবর্তন হল না। মাকে জড়িয়ে না শুলে ঘুম আসে না ওর, মার সঙ্গে এক পাতে না খেলে পেট ভরে না, মা কাছে না থাকলে কিছু ভালো লাগে না।

উঠ্তি বয়সে যখন একলা একলা আকাশ দেখত কিংবা বৃষ্টি বেলায় কি ভর নিশীথে ক্ষণে ক্ষণে উদাস হয়ে পড়ত, সেই বয়সে শরীরের রকমফেরের সাথে সাথে নয়নের মনেও কেমন যেন একটা পরিবর্তন এসেছিল। মার সামনে বুক খুলতে কেমন লজ্জা লজ্জা করে, উদোম শরীরে হঠাৎ মার সামনে পড়লে বুকটা কেমন করে ওঠে। মা আদর করে যখন ওকে কোলে টানে তখন ওর শরীরটা শির শির করে ওঠে।

কখনো কখনো নয়নকে চান করাতে করাতে সুহাগী বলত, বুক কোমর পাছা—ই তিনেই ঝুমুর বাছা, বুঝলি? ই তিনের যত যতন করবি উরা ততই রতন দিবে।

ওর মা যখন থাকত না, নয়ন তখন ভাঙা আয়নায় লুকিয়ে লুকিয়ে তার নিজের চেহারা দেখত। সেই কিশোরী বয়সেই তাকে ডাগর ডাগর লাগত। পতিত, সুখি ওরা যখন খেলার ফাঁকে ওকে জড়িয়ে ধরত তখন ও মুখ ঝামটা দিত, কিন্তু বুকের মধ্যে ভালো লাগার ভাবটা বেশ বুঝতে পারত, ওর মধ্যে একটা সুখ শিরশির করে উঠত। ছেলেগুলো ওকে বউ করার জন্যে যখন ঝগড়া করত, কাড়াকাড়ি করত, তখন ও হাসত, মজা পেত!

এর মধ্যে ও বারকয় বাপের মুখোমুখি হয়েছে। ওর বাপের চেহারাটাও দিন দিন পাল্টে যাচ্ছিল। বাপের চোখের দিকে তাকিয়ে ওর গা ছম ছম করত, ও মার কাছে পালিয়ে যেত, মাকে জড়িয়ে ধরত। শেষে সুহাগী ওকে একটা ছেঁড়া ব্লাউজ পরতে দিয়েছিল।

সুহাগী যখন মেলায় যেত তখন একলা একলা নয়নের খারাপ লাগলেও ভয় করত না কারণ তখন সুহাগীর সঙ্গে তার বাপও মেলায় যেত। কিন্তু সুহাগী যখন রাতে ডাকবাংলোয় যেত তখন ওর খুব ভয় করত। বাপ রস খেয়ে ঘরে ফিরত, চিৎকার করত, খিস্তি খেউড় করত, কখনো কখনো তাকে ধরে পিটত। নয়ন চেঁচাতে পারত না, বিছানায় মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদত।

এমন এক রাতে যেদিন ওর মা ডাকবাংলোয় রাত কাটাতে গেছে, সে-রাতে এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটল।

নয়নের বয়স তখন নয় কি দশ। দুপুর থেকে ঝড় শুরু হয়েছে। ঝড় থেমেছে, কিন্তু ঝড়ের রেশ তখনও কাটেনি। মা বেরিয়ে যাবার সাথে সাথে নয়নও কলাই সেদ্ধ খেয়ে শুয়ে পড়েছিল। দরজা ভেজানোই থাকে কখন ওর মা ফেরে, সে জন্যে। সেদিন কিন্তু দরজা খুলে শুতে নয়নের ভয় করছিল তাই হুড়কো লাগিয়ে শুয়েছিল।

একটু রাতে ওর বাপ রস খেয়ে মাতাল হয়ে ফিরল। দরজায় ঘা পড়তে লাগল, খিস্তি খেউড় চলল আর তার সঙ্গে চিৎকার। তার দাপাদাপির চোটে নড়বড়ে দরজাটা ভেঙে পড়বার যোগাড়। নয়ন ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দিল। হড়মুড় করে লোকটা ঘরে ঢুকল, তারপর চাটাইয়ের কাছে গিয়ে হাতড়ে হাতড়ে ওর মাকে না পেয়ে চিল্লাতে লাগল।

ওর বাপকে চিল্লোতে দেখে নয়ন বলল, মা ডাকবাংলোয় গেছে।

বাপ ঝাঁঝিয়ে ওঠে, কি বুললি, ও হারামি ডাকবাংলো গেছে? কিসের লেগে—টাকা? গতর বেচতে? হারামিকে কালই লাথ্যে তাড়াব।

সমস্ত ঘর দাপাদাপি করে বেড়িয়ে শেষে নয়নের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।—তু শালি ইথানে কি করছিস? তু গেলি নে কেনে? তারপরেই লোকটা কেমন যেন ক্ষেপে গিয়ে থু থু করে থুতু ছিটিয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

পরের দিন সকালে নয়নের জ্ঞান ফিরেছিল। জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ওর দেহের যন্ত্রনা তীব্র হয়ে উঠেছিল। ক্রমে যন্ত্রনাটা অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

সেবার বেশ ক'দিন ভুগে সুস্থ হয়েছিল।

ওকে একটু সুস্থ হতে দেখে ওর মা বেরিয়েছিল দলদল নিয়ে। বাপ নিয়েছিল ঢোল, তবলাডুগী আর সুখির বাপ নিয়েছিল হারমুনিয়ম। এই শীতটা ওরা নানান্ মেলায় ঘুরে বেড়াবে। কলেশ্বর, লাভপুর, মহেশপুর, বৈরেগীতলা—নানান্ মেলায় ঝুমুর দলের গান বসবে। আগের থেকে দু'দিন চারদিন ছয়দিনের বায়না করতে হয়। থানার বাবুদের মত করাতে হয়। ঝুমুরগান বসানোর ব্যাপারে মেলায় কর্তাদের ঝোঁকটাই বেশী কারণ ও থেকে আয়টা নেহাত কম হয় না, তাছাড়া আনুষঙ্গিক হিসাবে চোলাই মদ আর জুয়োর ফেরও বসে।

কোথাও কোথাও আবার ঝুমুর নিয়ে পাল্লা চলে। পাড়ায় পাড়ায় রেষারেষি আছে। এ পাড়ায় স্কুল হয় তো, ওপাড়ায় পঞ্চায়েত অফিস বাড়ি হয়। এ পাড়ায় ব্লক অফিস হয় তো, ও পাড়ায় হেল্‌থ সেণ্টার হয়। এ পাড়ায় স্কুল দিদিমণির বাসা হয় তো, ও-পাড়ায় সমাজ সেবিকাদের বাসা হয়। এ ভাবে পাল্লা চলে, এ ভাবেই রেষারেষি।

তাই ও পাড়ায় ঝুমুর বসলে, এ পাড়ায় খেমটা বসে। তখন নির্লজ্জতার পাল্লা চলে। এ পাড়ায় ভাবঘাঁটির দল এলে, ওপাড়ায় থাকে রামপুরহাটের দল। কোন্ দলে কি রকম ডবকা ছুকরী আছে, তার ওপর পাড়ার হার জিত। যে পাড়া জবর গতরের ঝুমুরী খুঁজে আনতে পারবে সে পাড়ায় মানুষজন ঝেঁটিয়ে যাবে, সে পাড়ার জাঁক বাড়বে, মান বাড়বে, অন্য পাড়ায় লোক জুটবে না, গান জমবে না।

এই রকম পাল্লায় পড়ে ঝুমুরীদের অনেক সময় অনেক হুজ্জোতে পড়তে হয়। অনেক ষড়যন্ত্র চলে। দল ভাঙাভাঙি নিয়ে নানান্ খেলা শুরু হয়ে যায়।

সেই টগবগে, আনচান, নধর বুক পাছার পেল্লাই ঝুমুরীকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে। পিছনে লোক লাগে। ভালো কথা, বুঝ কথা, রূপোর দর কষাকষিতে যদি ঝুমুরী না ভাঙে তাহলে জোর জবরদস্তি চলে। কোন ফাঁকে একলা পেল তো লোপাট আর তেমন না হলে লাঠিবাজী করে লুটে আনতে হয়। তা নিয়ে লাঠালাঠি, খুন জখম, থানা পুলিশ। পাড়ার একটা ইজ্জত আছে না! তার জন্য সব কসুর। আর এই রেষারেষির টানাপোড়েনে ঝুমুরদের অবস্থা 'কাহিল। হয়তো রাতারাতি পালিয়ে আসতে হয় নয়তো দল চিনে ভিড়ে যাওয়া।

কোন না কোন ঝামেলা আছেই। হয়তো কোন গাঁয়ে গান করতে গেছে। দলে হয়তো তেমন লাগসই, পাসালো গতরের ছুকরী আছে। ব্যস্, গাঁয়ের বাউণ্ডুলে ছোঁড়াগুলোর মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। নাচের আসরে আর রাতের বায়নায় মন ভরে না। ঝুমুরীকে গেঁথে ফেলার চেষ্টা। ঘুর ঘুর করে, ফুসুর ফুসুর গুজুর গুজুর চলে। লোভের টানে হয়তো ঝুমুরী রাজী হয়ে গেল আর দলে ফিরল না। গাঁয়েই কোন আস্তানা দেখে ঝুমুরীর ঘর হল। গাঁয়ের ছোকরাদের চাঁদা করা ঝুমুরী, বারোয়ারী ঝুমুরী। কাউকে না বলার উপায় নেই। এক ঝুমুরীকে দশ মিনষের খাকৃতি মেটাতে হয়। তখন আর ঝুমুরী, ঝুমুরী থাকে না; রাখনি কি রাখতি হয়ে যায়। গাঁয়ের ভালো মানুষের বউয়েরা চোখ কুঁচকে, বার-গতরে মাগী বলে ডাকে, রাঁঢ় বেবুশ্যে বলে গাল পাড়ে, আবার হাফ গেরস্থ বউরা অমন মেয়ের সঙ্গে আড়ালে আলাপ করে, সই পাতায়, এটা সেটা পাচটা ওষুধ—পেট-খসানো পেট-পড়ার টোটকা জেনে নেয়।

আর ঝুমুরী যদি বাঁধা-বরাতে রাজী না হয়, পুকুর পাড়ে কি গাছের ডালে কি রেললাইনে একদিন ঝুমুরীর মৃতদেহ লটকে থাকে, ঝুমুরীর সব সুখ সাধ ঐ ভাবে শেষ হয়ে যায়।

তাই আঁচালেও দোষ, না আঁচালেও ছাড়ান নেই। ঝুমুরীর যতক্ষণ গতর আছে ততক্ষণ হুজ্জোত, নিত্য ঝামেলা। তাই অনেক সামলে, অনেক কলা কৌশলে নিজেদের তাদের বাঁচিয়ে চলতে হয়।

এই ভাবে পাঁচটা মেলায় ঘুরে ঘুরে আর অন্য সময় গতর খাটিয়ে ঝুমুরীদের জীবন কাটে।

নয়নের আজ আর স্পষ্ট ভাবে মনে পড়ে না ঠিক কবে থেকে সেও মেলার দলে ভিড়ল। তবে সেই যন্ত্রণার পর চার পাঁচ বছর পেরোতে না পেরোতেই ওর মা ওকে ডাকবাংলোতে নিয়ে গিয়ে বউনি করিয়েছিল। সেই দিনটির কথা নয়নের বেশ মনে পড়ে। হযতো সব ঝুমুরীই ঐ দিনটিকে মনে করে রাখতে চায়।

ডাকবাংলোয় হ্যাজাক বাতি জ্বলা ঘরে ওর কেমন ভয় করছিল। ওদিকে পিছনের কোন ঘর থেকে জল পড়ার শব্দ হচ্ছিল। ও দুরুদুরু বুকে মার হাত ধরে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর মার হাতের মধ্যেই ওর হাত ঘেমে উঠছিল। ও ঘরের চারদিক, জামাকাপড়, বিছানা ইত্যাদি সব ভয়ে ভয়ে দেখছিল।

এমন সময় খুট করে শব্দ হল। পিছনের দরজা খুলে একটা সুন্দরপানা ছেলে ঢুকল। ওর কোমরে একটা মোটা ফুলকাটা ভিজে কাপড় জড়ানো। ও নয়নের কাছে এসে ঠোঁটটা সরু করে শিস্ দিল, জিভ দিয়ে আওয়াজ করল, তারপর হেসে ওর মার হাতে একটা বড় নোট গুঁজে দিয়ে গালটা টিপে দিল।

সুহাগী মেয়েকে ঘরে রেখে বেরিয়ে আসছিল। নয়নও পিছন পিছন বেরোতে যাচ্ছিল। সুহাগী মেয়েকে মানুষটার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, কি বুকা রে, তু আজ বাবুর কাছে থাকবি। বাবু তুকে কত আদর করবে, কত পয়সা দিবে। তারপর বাবুর দিকে তাকিয়ে হেসে চোখ মটুকে বাইরে চলে গেল। ঘরের দরজটা বাইরে থেকে টেনে দিল।

সুন্দর বাবুটি শিষ দিতে দিতে নিজের বুকে পাউডার ছেটাল। একটা ছোট শিশি নিয়ে নয়নের মুখে জলের মতো কি ছিটিয়ে দিল। একটা মিষ্টি গন্ধ এসে নয়নের নাকে লাগল। নয়ন ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছিল। বাবু এক হাতে ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরে বলল, ভয় কি রে, দেখ না কেমন সুন্দর গন্ধ, তোর বুক থেকে ভুর ভুর করে সুবাস ছুটবে, বলে ওর বুকের মধ্যে শিশিটা উপুড় করে ঢেলে দিল। তারপর বাক্সর তলা থেকে একটা চ্যাপ্টা মতন বোতল বের করে ঢকঢক

করে গলায় ঢালল। একটা মিষ্টি গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নয়নের বুকের গন্ধটার সঙ্গে মিশে যায়।

বাবুটি দু'আঙুলে ওর গাল টিপতে টিপতে বলল, একটু খাবি না কি, ভালো লাগবে, দেখবি কেমন সুখ, তোর শরীরটা হাওয়ায় উড়তে থাকবে।

নয়নের ভয় ভয় করলেও বুকের ভেতরে একটা ইচ্ছেও যেন মাথা কুটতে শুরু করেছিল। ও মাথা নাড়লেও বাবু যখন এক চুমুক খেয়ে বোতলটা ওর মুখে ঢুকিয়ে দিল, ও আর না করেনি। ঢক ঢক করে একসঙ্গে কয়েক ঢোক গিলে ফেলেছিল। আগুনের হল্কার মতো তরল জিনিসটা গলা বুক দিয়ে নামতে থাকল। বুক জ্বালা করে ঢেঁকুর উঠল ক'টা, তারপরই কেমন ঘোর ঘোর লাগতে লাগল।

নয়নের মনে হল, ওর শরীরটায় আর কোন ভার নেই, ও পালকের মতো হাল্কা হয়ে গেছে। ওর রক্তের মধ্যে কেমন তোলপাড় শুরু হয়েছে। মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করছে। ওর বুক কোমর তলপেট সব কিছুতে শুড়শুড়ি লাগছে। ও নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছিল না, ও বিছানায় গড়িয়ে পড়ে ছিল…।

বেশ কিছু পর দরজা ঠেলে ওর মা হাসি হাসি মুখে ঘরে ঢুকেছিল।

নয়নকে ঠেলে বলেছিল, যা বাবুকে পেরনাম কর। আজ থেকি তুর আপুন কাম শুরু হল, তু লয়ন ঝুমুরী হলি। বাবু তুকে খালাস করি দিল। পেরথম তুর শরীলটা বাবুর ভুগে লাগল। বাবুকে পেরনাম করে বকশিষ চেহে লে। জীবনটা ভর যেন তুর এমুন গতর থাকে, এমুন রুজগের হয়।

নয়ন পা ছুঁতে যেতেই বাবু ক'পা সরে গেল। তারপর বাক্স থেকে আর একটা বড় নোট বের করে নয়নের হাতে গুঁজে দিয়ে গালটা টিপে দিল। এরপর নয়নের মা নয়নকে নিয়ে পথে নেমে এসেছিল।

সেই থেকে নয়নের ঝুমুরী জীবন শুরু। নিজের রোজগার শুরু। প্রতিবারই মরশুমে বেরোবার আগে ঝুমুরীদের রেওয়াজ মত সে কোন পুরুষের সঙ্গে রাত কাটিয়ে বকশিষ নেয়, শরীরের বউনি করে, আশীর্বাদ চায়, সারা মরশুমটা যেন অমন কামাতে পারে, শরীরটা অমন তাজা থাকে।

তারপর কত মেলা ঘুরল নয়ন, কত রকম মানুষ দেখল, মানুষজনের বিচিত্র রুচি, হাজার রকম খাঁই। মেলায় ঘুরতে ঘুরতে মানুষ চিনেছে, মানুষের চোখের দিকে তাকালেই ভিতরের বাক্যিটা বুঝতে শিখেছে, গতরের দাম বুঝেছে, দাম হাঁকার ঠেক বুঝেছে, তাই জিওল মাছের মতো পিছলে পিছলে বেড়ায়, ধরতে গেলে অনেক মদত দিতে হয়।

লোকে বলে, সায়না ঘাঘু, মাগী নাম লিখিয়ে সতী বেউলোর মতো গতর আগলায়। ঠেশ ঠমক দিয়ে মাগী মন্তর ঝাড়ে আর সব জুয়ান মরদগুলো ভেড়ুয়া বনে পিছে পিছে ব্যা ব্যা করে, মাগী যা শিখায় তাই উদের রা। ঘর গেল, বো গেল, জমি গেল, আবাদ গেল, এতটুকুন হুঁশ নাই, সব শালা বাদ্‌লা পুকার মতো ছোটে, মাগীর এট্টু সুখ পাবার ল্যাগে সব জল টেনে বেড়ায়। মাগী এট্টু নজর দিল তো সব হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

হুঁ, এমুন জোতের ম্যাইয়ে মা কামিখ্যের বিদ্যেধরী, শালা, বাঁজা বতুর ল্যায় শরীল পুষচে।

নয়ন বোঝে সব, জানে সব, আর ঐ জন্যই তার এত কদর, ঐ জন্যেই আজো সে দলের রাণী। বায়না করার আগে তার কথাটা জিজ্ঞেস করে নিতে বাবুরা ভোলে না। অন্য কোথাও বায়না থাকলে আগে ভাগেই নয়নের নাম করে ক'টা টাকা ধরে দিতে ভোলে না। যেখানে যাবে যাক, কিন্তু এ গানের সময় ওকে চাইই।

কর্তা দর বুঝে নিয়েছে। বাযনা থাক না থাক, হাঁকিয়ে দেয়, উ গানে যেতি পারব না, আগুতেই বায়না লিয়েচি দখিন পাড়ায় গান হবে, লয়নকে যেতি লাগবে। যদি বুলেন তো অন্য ঝুমুরীর ব্যবস্থা হতি পারে।

লোকগুলো ক্ষেপে ওঠে, না না কত্তা, ও সব ছাড়, সি কুথা থেকি আসছি, তুমার দলের নাম আছে বুলেই এত কথা, আর লয়ন ঝুমুরী না থাকলি কি লাচ জমে, তুমিই বুল। গান যিখানে আছে হোক, বাগার দিচ্ছি না, কিন্তু আমাদের মেলায় যেতি হবে, উই লয়নকে লিয়েই, তাতে তুমাদের ঠকতি হবে না, ঠিক পুষায়ে দিব।

এত দাম, এত কদর, এত ডাকাডাকি—নয়ন বোঝে সব, কিন্তু সব যে তার গতরের জন্যে, শরীরটার জন্যে এই চিন্তা তাকে কেমন ক্লান্ত করে তোলে। অথচ ও যে এত দরদ দিয়ে গান গায়, পালা গায়, ছবির ম্যাইয়ের মতু পা হাতে বোল ফুটিয়ে নাচে তার কোন কদর নেই, তার কোন নাম নেই।

তাই মন না চাইলেও নয়ন ঝুমুরী ঝুমুরীই থেকে গেল। আর কিছুতে ওর মন ওঠে না। মেলায় মেলায় ঘুরে নাচের নামে গতর বেচে, দলের বায়না হয় তার গতর দেখে।

এই ভাবেই ঝুমুরীদের জীবন কাটে। একদিন শরীরে ভাঁটা পড়ে, বাঁধা গতরে চটা পড়ে, মাংসল অঙ্গগুলো শুকিয়ে শুকিয়ে চিম্‌সে হয়ে যায়। চোখে

আর চমক ফোটে না, কেমন ঘোলা ঘোলা মরা মাছের মতো ফ্যাকাশে হয়ে যায়, শরীরে আর ফুল্‌কি ছোটে না, বাজ খাওয়া নারকেল গাছের মতো হাড্ডিসার হয়ে যায়। কোন দাম নেই, কোন দর নেই, কোন ডাক নেই। সেদিনের সেই ঝুমুর রাণী একদিন কত সহজে বাতিল হয়ে যায়।

এ-ই নিয়তি, ঝুমুরীরা জানে। জানে বলেই তাদের কোন হা-হুতাশ নেই। যতদিন পারে তাই চুটিয়ে লুটে নেয়। যদি সেই দিনের জন্যে কিছু সঞ্চয় করতে পারল তো অনেক। না পারল তো ক্ষোভ নেই, দুটো ভাল খেয়ে পরে, সখটা আশটা মিটিয়ে যদ্দিন ভোগ করা যায়, সেটাই লাভ।

নয়নও এর ব্যতিক্রম নয়। গা এলিয়ে দিয়ে ছিল। মনের ইচ্ছেগুলো মাঝে মধ্যে মাথা কুটলেও, কেটে যাচ্ছিল, হয়তো বাকী জীবনটাও এই ভাবেই কেটে যেত। কিন্তু সেদিন তালপুকুরে, সেই পাখি ডাকা ঠাণ্ডা হাওয়ায় হঠাৎ মানুষটাকে দেখে নয়নের সব ওলট পালট হয়ে যায়। কুড়িয়ে পাওয়া মানুষটার চিন্তায় ও কেমন পাল্টে যেতে থাকে। ঐ ব্যারামি মানুষটার দরদে, কথায় বার্তায় ওর মনের মধ্যে কি রকম এক সুখ দুঃখের কান্না শুরু হয়। মানুষটাকে সব কিছু বলে সুখ, সব উজাড় করে দিয়ে সুখ, মানুষটার ভাবনায় তলিয়ে গিয়ে সুখ। অমন উড়ু উড়ু বিবাগী মানুষটাকে দেখলে মায়া হয়, মন বসে যায়। মানুষটার এতটুকু সুহাগে নয়নের বুক ভরে ওঠে, এতদিনকার ব্যথা বেদনা লাঞ্ছনার কথা ভুল হয়ে যায়, মানুষটার মমতায় নয়ন অন্য মানুষ হয়ে যায়।

বৈরেগীতলার ছিটেবেড়ার ঘরে রসিকের মুখোমুখি বসে নয়নের সেই সব বহু পুরানো হারিয়ে যাওয়া কথাগুলো মনে পড়ছিল। পুনরায় নতুন করে পুরাতন স্মৃতি তাকে উদ্বেল করে তুলছিল। তার ফেলে আসা জগতটা যেন সে দিন দিন ভুলেই যাচ্ছিল।

ওর ভাবতে ভালো লাগছিল এবারকার বউনিটার কথা। কি ভাগ্য তার, কত পুণ্য করেছিল তাই এই মরশুমে রসিকের সঙ্গে দেখা হল। রসিক তাকে ভালোবাসল। রসিক ভালোবেসে তার হারিয়ে যাওয়া কথাগুলো শুনতে চাইল।

কখন তার কথা বলা শেষ হয়ে গেছে কিন্তু তার ভাবনা ফুরালো না। ওদিকে যে বেলা বেড়ে গেছে, ওর খেয়াল নেই। ও আকাশ পাতাল ভেবে চলেছে। হঠাৎ রসিকের ডাকে তার খেয়াল হল।

রসিক খুব গভীর সুরে ওকে ডাকছে, নয়ন, নয়ন!

উঁ, বলে মুখ ফিরিয়ে নয়ন দেখে রসিক মিষ্টি করে হাসছে।

কি রে, আমায় খেতি দিবি না, উদিকে যে বেলা পড়ে এলো। বেলা থাকতি থাকতি বেরুতে হবে নয়তো কাটুয়ার টেরেন ধরা শক্ত হবে।

নিজের অন্যমনস্কতার জন্যে নয়ন লজ্জা পেল। ও তাড়াতাড়ি রাঁধুনীবুড়ির কাছ থেকে রসিকের খাবার নিয়ে এলো। রসিকের খাওয়া হতে হতে ও মেলা থেকে একটা মিষ্টি পান কিনে আনল।

রসিক হাত মুখ ধুয়ে ঝোলাটা কাঁধে তুলে নয়নের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়াল, ওর মুখটা একটু তুলে ধরে বলল, লয়ন, তু ই বছরটা কষ্ট করে কাটা, ফিরে বছর তুকে আর মেলায় আসতি হবে না। তুকে আমি ঘরে লিয়ে যাব। তুর ঘব হবে, সোয়ামি হবে, ছ্যালে হবে। তু ই বছরটা কষ্ট করে থাক।

রসিকের কথা শুনতে শুনতে নযন আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না, ওর চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল। ও মাথা হেঁট করে রসিককে প্রণাম করে পায়ের ধূলো জিভে মাথায় নিল।

রসিক ওকে বুকে টেনে নিয়ে খুব আবেগ ভরে বলল, লয়ন, তু কাঁদিস নে, তুর কাঁদন দেখলে আমার বুকে বড় বাজে। তু একটু হাস নয়ন, তুর হাসি দেখ্যা আমি বিদেয় লি।

তবু নয়নকে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নয়নের মুখটা দু'হাতের আঁজলায় ধরে উঁচু করে তুলে বলল, লয়ন, তু হাস, তুর হাসি না দেখলে আমার যাওয়া হবে না। লয়ন, লয়ন বউ—!

নয়নের চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ল। নয়নের ঠোঁটের কোণে অপূর্ব এক হাসি ফুটল।

রসিক গভীর সোহাগের সঙ্গে আঙুল দিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিল আর সস্নেহে নয়নের ঈষৎ ফাঁক ফোলা ফোলা কাঁপা ঠোঁটে দীর্ঘ চুম্বন এঁকে দিল। তারপর কিছুক্ষণ ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে থাকার পর রসিক ওকে ছেড়ে দিয়ে আঙিনাতে নামল।

হঠাৎ নয়নের খেয়াল হল।—লাগর, লাগর একটু দাঁড়াও। ছোট্ট আহ্লাদী বউয়ের মতো নয়ন লাফিয়ে দাওয়া থেকে আঙিনাতে নামল, তারপর রসিকের কাছে গিয়ে সেই পানটা দিল।

পানটা হাতে নিয়ে রসিক হেসে উঠল, তু একটি পাগলি, তুর এত ভুল! বিহা হলি তুকে লিয়ে ঘর করা যাবে না। তু হয়তো ভুলে কুন্‌দিন আমাকেই চিনতি পারবি না।

রসিকের বলার ধরণে নয়ন খিলখিল করে হেসে উঠল। রসিকও হাসতে হাসতে পথে নামল।

রসিক যদি পিছন ফিরে তাকাত দেখতে পেত, তার বড় সাধের নয়ন বউ দাওয়ার বাঁশের খুঁটিতে মাথা রেখে তার পথের দিকে তাকিয়ে আছে। তার দু'চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ছে। আবেগে তার বুক ফুলে ফুলে উঠছে।

নয়ন রসিকের পথের দিকে তাকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

রসিক ফারাক্কা প্যাসেঞ্জারে চড়ে জঙ্গীপুর স্টেশনে নামল। তখন দু'প্রহর বেলা হবে। আগের রাতটা কাটোয়ায় কাটিয়ে ট্রেনে চেপেছিল। স্টেশনে নেমে অবাক, সব কেমন পাল্টে গেছে। জায়গাটা গঞ্জ গঞ্জ লাগছে। স্টেশনে পাকা বাড়ি উঠেছে, চায়ের দোকান, পাকা সড়ক, বিজলী বাতি, সাইকেল রিকশা। জায়গাটকে আর চেনাই যায় না।

রসিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিচিত দৃশ্যগুলো খুঁজে ফিরছিল। অনেক কথা অনেক ঘটনা ওর মনে পড়ছিল। ওকে কেমন এক ভাবাবেগে পেয়ে বসছিল।

সেদিনের সেই ছোট্ট শিশু পাকুড় গাছটা কী বিরাটই না হয়েছে। অসংখ্য ডালপালা বেরিয়ে জায়গাটা কেমন অন্ধকার অন্ধকার করে ফেলেছে। ওর পাড়ে এসে নাও ভিড়ত, খরানের সময় মাঠ পেরিয়ে গো-গাড়ি এসে জিরোত। ছাড়া বলদগুলো মচর মচর করে ঘাস খেতে খেতে বিলপাড় পর্যন্ত চরে বেড়াত।

কতদিন রসিক বাপের সঙ্গে নাও নিয়ে, গাড়ি নিয়ে এসেছে। গাছতলায় গাড়ি ভিড়িয়ে লারান কাজে যেত আর রসিক আপন খেয়াল মতো আকন্দ, পিটুলি, ভাঁটুল জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, ফড়িং ধরত, আপন মনে গান গাইত, নাক দিয়ে বাঁশী বাজাত, ধাড়ি ইঁদুর, কাঠবিড়ালি খুঁজে বেড়াত।

রসিক সেই মাঠ-ঘাট, গাছ-পালা চৌহদ্দিতে সেই পরিচিত দৃশ্যগুলো খুঁজে হতাশ হল। সব পাল্টে গেছে। অনেক কিছু নতুন হয়েছে, অনেক কিছু পুরনো হয়েছে। রসিকের স্মৃতির সঙ্গে অনেক কিছুই আর মেলে না।

হাঁটতে হাঁটতে রসিক আকুম্বা বিলের মাঝামাঝি এসে পড়ল। সমস্ত বিলটা খটখটে শুকনো। গোটা মাঠ থেকে গরম ভাপ উঠছে। সূর্যের তাপে হল্কা লি লি করে গোটা মাঠটায় কাঁপছে। এখানে ওখানে মস্ত মস্ত ঢেলা পড়ে রয়েছে আর তার মাঝেই চাষ হয়েছে। চৈতালীর গন্ধে সমস্ত বিলটা কেমন মৌ মৌ করছে।

ছোলা, মুশুরী, মটর, খেঁসারি—এত সব ফসলের চাষও আগে আর কোনদিন দেখে নি রসিক। এই গোটা বিলটা খাঁ খাঁ করত। তখন যত রাজ্যের আলকেউটে, শাঁখামুঠি, খরিস ঘুরে বেড়াত, কাটপোকা, তেঁতুলবিছের আড়ত হোত। একটু অসতর্ক হলে রেহাই ছিল না।

দিনের বেলাতে হাঁটতেই গা ছমছম করত। কদ্দিন ঐ কলকলির সাঁকোটায় দু' আধখানা হয়ে মানুষ পড়ে থাকতে দেখেছে সে। খরায় এই বিল ছিল ঠ্যাঙাড়ের আর বর্ষায় যখন বিলটা ফুলে ফেঁপে জলে থৈ থৈ করত তখন ডাকাতদের আড্ডা জমত। খাল, ঝিল, দহ পেরিয়ে কোন চড়ায় ওরা ওঁত পেতে বসে থাকত। দূরে স্টেশন থেকে কিংবা গ্রাম থেকে রাত-বিরেতে কি ভর-দুপুরে কোন নৌকাকে বিল পেরোতে দেখলে ওরা সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ত। তাদের সেই পনেরো দাঁড়ির ছিপ তীরের মতো অতর্কিতে এসে নৌকার গলুইয়ে ভিড়ত আর তারপরেই শুরু হোত ডাকাতি, রাহাজানি, খুনখারাপি। বিলের জল লালে লাল হয়ে যেত। যাত্রীদের আকুল কান্নায় ডাকাতরা প্রাণ ফাটানো হাসি হাসত, ভয়ে কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসত না। তাদের হাসি-কান্না বিলের ঝোড়ো হাওয়ায় হা হা করে উঠত।

রসিক হাঁটতে হাঁটতে কলকলির সাঁকোটায় উঠে থামল। সূর্য মজিতপুরের তালবনে আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। যদ্দুর দেখা যায় শুধু ধূ ধূ মাঠ, মাঠ ও আকাশ এক হয়ে গেছে। সারামাঠে রবিশস্যে কাঁচা রঙ ধরেছে। মাঠ জুড়ে বিচিত্র এক সবুজের মেলা বসেছে। সেই উঁচু সাঁকোটার ওপর দাঁড়িয়ে রসিক চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

বর্ষায় এই ফাঁকা বিলটার আর এক চেহারা। কোথাও মাটি দেখা যায় না, শুধু জল আর জল। কোথাও কোথাও দেড়বাঁশ, দু'বাঁশ জল। নৌকা ছাড়া পথ নেই। হাটবাজার, স্টেশন, স্কুল, কাছারি সব নৌকোয় যেতে হয়। তখন তাদের গাঁ-কে দ্বীপের মত মনে হোত। চুতুর্দিকে জল, মধ্যিখানে ডাঙার মতো, তাল খেজুরে ঢাকা তাদের মনোহরপুর গাঁ।

বর্ষার সময় মেয়ে পুরুষের আর ঘরে মন বসে না। সংসারের পাঠ কোন রকমে চুকিয়ে ওরা বিলের ধারে এসে জমে। গাঁয়ের উঠ্‌তি বয়সের মেয়েরা স্নানবেলায় ঘাটে গিয়ে বিল তোলপাড় করে চান করে। বিকেলে হাত ধরাধরি করে বিলের পাড়ে ঘুরে বেড়ায়। ছেলেরা সব সাল্‌তি নিয়ে বিলে পাড়ি জমায়। লগি ঠেলে তারা মাঝ-বিলে গিয়ে নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে গলা ছেড়ে গান ধরে, জমিয়ে গল্প করে কিংবা কুমারীদের কল্পনায় পাগল হয়।

বর্ষা এলে গাঁয়ে যেন সুখ কাড়াকাড়ির ধূম পড়ে যায়। ডাগর মেয়ে কিংবা জোয়ান ছেলের বিয়ের পাকা দেখা হয়; নতুন বউ স্বামীর বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে সোনার নাকছবি কিংবা রূপোর কোমরবিছের জন্য বায়না ধরে, সদ্য প্রসূতিদের বুক বর্ষার হাওয়ায় দুধে টইটম্বুর হয়ে ওঠে, পোয়াতির মন বিলের ঠাণ্ডা বাতাস বুকে নিয়ে আশা আকাঙ্ক্ষায় ভরে যায়। সারাটা বছর এ গাঁয়ের মানুষ খাটে আর বর্ষার সময় হাত পা ছড়িয়ে সুখ খোঁজে, সুখ বিলোয়। বছরের প্রথম বৃষ্টির সূচনা থেকেই সারা গাঁয়ে উৎসবের সাড়া পড়ে যায়।

প্রত্যেকের ঘরেই দু-চারজন আত্মীয় কুটুম আসে। বাইরে যারা চাকুরে তারাও দু-দশদিনের জন্য গাঁয়ে বেড়িয়ে যায়। আর এই সব নানান্ কাজে চলাফেরার জন্যে বিলটা লাল, নীল, হলুদ পালে ভরে ওঠে। জেলে ডিঙি, বজরা, সাল্‌তিতে গোটা বিলটার সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

পুজোর সময় এই বিলকে ঘিরেই আর এক উত্তেজনা। ভাসানের দিন আর পাঁচটা গ্রাম থেকে বিশ দাঁড়ির ছিপ আসে তারপর শুরু হয় বাইচ। সে সব ছিপের আবার কি বাহারে চেহারা, কোনটা হাঙরমুখো, কোনটা মকরমুখো, কোনটা বা ময়ূরপংখী, আর কি ঝলমলে রঙ সব—কোনটা রাজহাঁসের মতো দুধ সাদা, কোনটা আকাশের মতো নীলাভ আবার কোনটা বা পড়ন্ত সূর্যের মতো লাল্‌চে। ছিপের রঙ মিলিয়ে দাঁড়িদের মাথায় ফেটি বাঁধা।

হুই যে পাড়    মাররে দাঁড়।
চল্‌রে নাও    উজান গাঁও।
চালাও হাত    বাজী মাত্‌॥

বোলের তালে তালে বিশ দাঁড়ের শব্দ ওঠে ছপ্‌ ছপ্‌, তীরের মতো ছিপ ছোটে   বিলের শেষে পূব কোণে মজিতপুরের গাঁ ঘেষে ঘোড়ানিম গাছের মগডালে বাজী বাঁধা থাকে—বিশটা কাপড় গামছা আর বিশটা রূপোর টাকা, যে ছিপ আগে পৌঁছবে তারই জিত, তারই ঐ পুরস্কার।

পাড়ের লোক সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উৎসাহ যোগায়, উত্তেজনায় তাদের মধ্যে দল ভাগাভাগি হয়ে যায়, কখনো কখনো মারামারিও বাধে—তবু এই বাইচ একটা দারুণ উন্মাদনার ব্যাপার। পূজোর ক'দিন ধরেই তার প্রস্তুতি, বাইচ নিয়ে গালগল্প। সেই সব দিনের কথা ভাবতে ভাবতে রসিক কেমন উদাস হয়ে পড়ে। কিশোর বেলার ছবিগুলো তার মনে এক মিষ্টি আমেজ ছড়িয়ে দেয়।

মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক বালিহাঁস প্যাক্ প্যাক্ করে উড়ে গেল। দূর থেকে আরো কয়েক ঝাঁক উড়ে আসছে। এই সময় বিলের আশে পাশের টুকরো জলায় অনেক শ্যামকুল, সরাল, চখাচখি ভিড় করে। তারা সবাই কলরব করতে করতে ঘরে ফিরছে।

হাঁটতে হাঁটতে রসিক বিলকালীর থানে এসে বসে। গাঁয়ের প্রান্তে বিলমুখো এই মণ্ডপে একটু জিরিয়ে নেয়। যেদিন গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল সেদিনও এইখানে এসে বসেছিল। কি ভেবে একটা পেন্নাম করে বিলে নেমেছিল। সেদিনও বিলটা ছিল আজকের মতো খটখটে শুকনো, আব সারা মাঠে খরাব তেজ লি লি করে ছুটে বেড়াচ্ছে। তবে সেদিন এত চাষ আবাদ হয়নি, সবটা কেমন খাঁ খাঁ করছিল।

বাপের সঙ্গে খিটমিট বাধছিল ক'দিন থেকেই। ও চৌধুরীদের ছোটবাবুব সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, খেলা করে—এ সব রসিকের বাপ নারানের মোটেই পছন্দ হয়নি। নারাণ বলত, তু বাবুদের ছ্যালের সাথে খেলা করবি, ঘুর‍্যা বেড়াবি, ইটা ভালো লয়। তুর বাপ উয়ার বাপের চাকর, তিন পুরুষের ই খেটি খাওয়ার কাম আর তু কি না বাবুদের ছ্যালের সাথি মস্করা মারিস? ছোটবাবু বড়টি হলে তু তো উয়ার চাকর হবি। মনিব চাকরে কিসের পীরিত, ইতে দশজনায় দশ কথা কয়, ইটা ভালো লয়। তু ই পাড়াব রাজবংশীদের ছ্যালের সাথি মিশতি পারিস্ না?

রসিক কোন উত্তর দিত না, কিন্তু রানার সঙ্গে মেশাও তার বন্ধ হয়নি। রানাকে, রানার বাড়ি, রানার পোশাক আশাক সব কিছু ওর ভালো লাগত। তাছাড়া রানার এত ন্যাওটা হওয়ার কারণ রানা ওর মাস্টার হয়েছিল, বলেছিল, তোর খুব মাথা। তুই আমার কাছে যদি ঠিকমত পড়িস তাহলে দেখবি দু'বছরেই তুই বৃত্তি পাশ করে যাবি।

রসিক ম্লান ভাবে হেসেছিল, দূর, আমার ছেলেট, পেংসিল, বুই কিছুই নাই, পড়ব কি করে ?

তারপর থেকেই রসিকের পাঠ শুরু হয়েছিল। রানার খোলেন ঘরে, বাড়িতে অথবা মণ্ডপে বসে ওর পড়াশুনা চলত। তাই ইদানিং ও নিজের বাড়িতে থাকত কম, রানার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াত।

নারান নিজের মনে বকবক করত, গালমন্দ করত, কিন্তু রসিককে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। ও ঠিক তক্কেতক্কে থাকত, সময় বুঝে লেখাপড়া চালাত। মাঠে গরু চরাতে চরাতে নিজের মনে সুর করে অ আ ক খ পড়ত, কখনো ঘুটিং নিয়ে এক দুই তিন খেলত। তারপর বেলা পড়ে এলে বিলকালীর থানে বুড়ো পাকুড় গাছটার তলায় গিয়ে বসত। ঐ পথ দিয়ে রানা স্কুল থেকে ফিরবে, আর ঐ থানে বসে পড়া ধরবে।

রানা একদিন ওকে একটা শ্লেট দিল। রসিক ঘরে ফিরে লম্ফর সামনে বসে সেটায় আপন মনে গুণ গুণ করে আঁক কষছিল।

নারান ঘরে ছিল না। ঘরে ফিরে রসিককে আঁক কষতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, খুব যে লায়েক হলছিস লাগছে ? বাবুর দেখাদিখি লিখাপড়া শিখার সখ, শালা তুর বাপ চাষা আর তু লিখাপড়া শিখে ভদ্দরলোক হবি ? তুর জমি কুন্ লাটে চাষ করবে বুল ? বাপের খুব গতর দেখছিস, না ?

তারপর চিৎকার করে বলল, হটালি ? হটা উ সব—আঁক কষতি হলি ঘর থেকি বার হয়ে গিয়ে কর, ইখানে উ সব চলবে না।

রসিক প্রথমে কিছুই বলে নি শেষে ও খানিকটা রেগেই উত্তর দিল, তা ইতে তুর কি ? তুর কি ক্ষেতি হল ? আমি তো দিনের কাম সার্‍্যা আঁক কষছি, ইতে তুর গায়ে লাগে কেনে ?

ছেলের কথায় নারান আর রাগ সামলাতে পারল না। হুঁকো ফেলে একছুটে এসে শ্লেটটা কেড়ে নিয়ে দাওয়ায় মারল এক আছাড়। শ্লেটটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল।

রসিক ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে পড়ল। শ্লেটের সঙ্গে ওর বুকের ভেতরটাও ভেঙে পড়ছিল। ও কিছু না বলে উঠোন পেরিয়ে দে বাবুদের বাড়ির পাশ দিয়ে বিলকালীর থানে গিয়ে বসল। আর এক সময় উঠে বিলের পথ ধরে হাঁটতে শুরু করে দিল।

তারপর থেকে শুধুই চলেছে। আজ এখানে, কাল ওখানে।

মন বসাতে পারে না ও কোনখানেই। তাই চলার যেন শেষ নেই। সেই থেকে ও গাঁয়ের, বাড়ির, বাপের খবর রাখে না।

রসিককে ঘিরে আবছা অন্ধকার নেমে এসেছে। দূরে রাজবংশীপাড়ায় মিটমিট আলো দেখা যাচ্ছে। রসিকের বাপের জন্যে মন কেমন করছিল। বাপ এখন বেঁচে আছে কি মরেছে তাই-ই সে জানে না।

বিলকালীর থানে একটা প্রণাম করে ও দ্রুত পায়ে ঘরের দিকে ফিরল।

দু-একজন পথ চলতি মানুষ রসিককে দেখে থমকে থেমেছিল কিন্তু ওর চেহারা দেখে সাহস করে কিছু বলে নি। সেদিনকার রসিকের সঙ্গে আজকের রসিকের অনেক অমিল। রসিকের এখন বাবরি চুল, গায়ে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পিরান, আর আধখানা ধুতি লুঙ্গি করে পরা। রসিকের কালো রংটা আরো চিকন হয়েছে। রসিক দ্রুত ঘরের দিকে হাঁটছিল তাই থমকে থেমে থাকা মানুষগুলোকে লক্ষ্য করে নি।

দূর থেকে নিজের বাড়িটা চিনতে পারে না রসিক। বার প্রাচীরটা ভেঙে ভেঙে পড়েছে, কোথাও কোথাও বৃষ্টির জলে ধুয়ে গেছে। ঘরের চালটা হাওয়ার দাপটে ঝোড়ো কাকের মত দেখাচ্ছে। এ বর্ষাটা আর টিঁকতে পারবে না। তবে কি বাপ আর কাজ করতে পারে না? রসিকের বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে রসিক দেখল, বার-দরজাটা খোলা। ঢুকতেই তার নজরে পড়ল, তুলসীতলায় প্রদীপ হাতে একটি মেয়ে।

রসিক ঢুকতে একটু ইতস্তত করছিল। মেয়েটাই দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলো, একটু ঠাণ্ডা গলায় বলল, আপুনি কাবে ঢুঁড়ছেন?

রসিক অবাক হয়ে বলল, কেনে, ইটা কি নারান মাঝির বাড়ি লয়? আমি উয়ার ছ্যালে, রসিক।

মেয়েটির হাতের প্রদীপটা একটু কেঁপে উঠল, আরো এগিয়ে এসে প্রদীপটা তুলে ভালো করে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, হাই গো তুমি রসোদা বটে। ইস্ একেবারে বোরেগী হই গেছ! ই বাবা, এদ্দিন পর আসতি হয়?

রসিকের কেমন ধাঁধা লাগছিল, মেয়েটিকে প্রথমে চিনতে পারে নি। মেয়েটির সমস্ত অঙ্গে যৌবন থৈ থৈ করছে। সমস্ত শরীরে একটা মাদকতা ছড়িয়ে

রয়েছে। চোখে মুখে খুশি খুশি ভাবটা ছটফটিয়ে উঠছে। ঐ প্রদীপের স্বল্প আলোয় বাতাসীকে দেখে রসিক অবাক হল।

বাতাসী তু বটে! কতটি বড় হুঙ্ গেছিস, কেমন ডাগরটি লাগছে।

বাতাসীর খুশিতে একটু লজ্জা ফুটল, হাই গো, কতটি বছর হল, সি খিয়াল আছে? তুমায় কিন্তু বড় সোন্দর লাগছে, যাত্রাদলের লায়ক লায়ক, লারান বাপ বাঁচি থাকলে বড় সুখ পেত।

রসিকের বুকে কে যেন হাতুড়ি পেটাল, কি, কি বুললি, বাপ বাঁচি নাই?

রসিক বাপের খবর জানত না বাতাসী বুঝতে পারে নি। রসিকের আর্তনাদে ওর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। ও একটু চুপ করে থেকে রসিকের একটা হাত ধরে বলল, রসোদা, এখুন তো হাত-মুখ ধোও, পার উ সব শুনো।

রসিকের আর কিছুই ভালো লাগছিল না, কিন্তু বাতাসীর পীড়াপীড়িতে উঠতে হল। পাশেই বাতাসীদের ঘর। একই উঠোন, মাঝে বেড়া দেওয়া। রসিক হাত-মুখ ধুয়ে এসে দাওয়ায় বসল।

ওর কাছে বসে বাতাসীর মা কাঁদতে কাঁদতে অনেক কথা বলেছিল, তু উই বুড়াটারে দেখলি নে, বুড়াটো তুর নাম লিতে লিতে মরি গেল। তু যিদিন ঘর ছাড়ি গেলি, বুড়ার বড় লেগেছিল। বুড়াটোর ব্যথা তু বুঝলি নে। তুর মা মারা গেলে উই বুড়াই তো বুক দিই তুকে পাললো আর তুর উযার এট্টু গালমন্দ সহি হল নি। কপাল, লয়তো মরার আগুতে প্যাটের ছ্যালের হাতে এট্টু জল পেল নি মানুষটা। ই বাতাসীর হাতে জল লিয়ে মানুষটি মরলে।

মাকে অমন করতে দেখে বাতাসীর আর সহ্য হল না, একটু ঝাঁঝিয়ে উঠল, মা, তু ই মানুষটারে খেতি-টেতি দিবি না? কুনঠে থেকি এলো, দিনভর উর খাওয়া জুটে কি জুটে নাই আর তু লিজের খিয়ালে বকর বকর শুরু করলি?

রসিক বাতাসীকে থামিয়ে বলল, তু একই মতুন আছিস, মারে বুলতে দে না, উ সব শুনা দরকার।

বাতাসীর মা বলে, না বাপ, উ ঠিকই বুলেছে, আগুতে দুটো খায়ি লাও, পরে কথা কওন যাবে।

দেখতে দেখতে রসিকের গাঁয়ে ফিরে আসার কথা ছড়িয়ে পড়ল। অনেকেই অবাক হল, কারণ রসিকের নামে অনেক কথাই শোনা গিয়েছিল। কেউ বলেছে উ ধম্ম পালটে ফকির হইছে, কেউ বলেছে দরবেশ হইছে, কেউ বলেছে উ কণ্ঠি লিয়ে বোষ্টুমী ধরে আখড়া করছে, আবার কেউ বলেছে সিদিন শহরে দেখলাম, উকে ধরে লিয়ে যাচ্ছে, কুথায় ডাকাতি না চুরি করছে।

রসিককে নিয়ে এই সব নানা রকম মুখরোচক আলোচনা হোত। শেষে আপনা থেকেই একদিন ও সব থেমে গেছে। তবু রাজবংশীদের বৈচিত্রহীন জীবনে রসিক একটা মস্ত ব্যতিক্রম, রসিক ওদের ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিল। ওরা হয়তো মনে মনে রসিক হয়ে উঠতে চেয়েছিল কিন্তু সাহসে কুলায় নি। তাই রসিকের প্রতি ওদের ঈর্ষা ছিল। রসিক ফিরে আসার খবরে তাই ওদের মধ্যে আবার আলোড়ন জাগল। মানুষটাকে দেখতে ভিড় জমল।

রসিক গাঁয়ে থাকবে শুনে অনেকেই সাহায্য করতে এগিয়ে এলো, বিশেষ করে তার পুরনো সঙ্গীসাথীরা। ছিদাম, হারান, নন্দ, রূপা ওরা হাত লাগিয়ে দু-চার আঁটি খড় এনে, বাঁশ যোগাড় করে রসিকের ঘরটা মেরামত করে ফেলল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওরা রসিকের গল্প শোনার জন্যে উদগ্রীব হয়ে পড়ত। ওদের ব্যাপার স্যাপার দেখে রসিক হাসে, কিছুটা মজাও পায়।

রসিকের খাওয়ার চিন্তাটা আপাতত মিটেছে। অন্তত কিছুদিন এ নিয়ে ওকে মাথা ঘামাতে হবে না। বাতাসীর মা-ই একদিন ডেকে বলেছিল, বাপ্ তু যদ্দিন না একটু গুছিয়ে বসছিস, ইখানেই যা হোক দুটো খেয়ে লিস। তুর বাপের ধেনো জমি তো আমার কাছেই আছে উর ল্যাগে তু চিন্তে করিস নে।

রসিকের মনটা গুছিয়ে উঠতেই বেশ ক'দিন কেটে গেল। ঘরে থাকলেই তার পুরনো সব কথা মনে পড়ে যায়। নারান বাপের কথা, মার কথা, বাতাসীর কথা। দাওয়ায় বসে রসিকের সেই সব কথাই মনে পড়ছিল।

পাশের বাড়ি বলেই হয়তো বাতাসীর এ বাড়িতে যাতায়াতটা খুব স্বাভাবিক হয়েছিল। আদুরে মেয়ের মতো রসিকের মার পিছন পিছন ঘুরত। রসিকের কাছে আব্দার করত, খুনশুটি করত। কোথায় কোথায় থেকে গাব, সবেদা, ফলসা নিয়ে এসে রসিককে দিত।

বাতাসীকে রসিকের বেশ লাগত। মেটে মেটে গায়ের রঙ, চোখ-মুখ ফোলা ফোলা আর খুব হাসতে পারত মেয়েটা। এর জন্যে তার হাতে মারও খেয়েছে খুব।

মাকে খুব অস্পষ্ট মনে পড়ে রসিকের। মার কথায় লাল সাদা, নীল সাদা ডোরাকাটা শাড়িটা ভেসে ওঠে। মার খুব পছন্দ ডোরাশাড়ি। কুটি কুটি হয়ে ছিঁড়লেও মা সেই ডোরাকাটা শাড়ি পরবেই। রসিক খেলতে খেলতে কিংবা দাওয়ায় বসে দড়ি পাকাতে পাকাতে মাকে দেখত। মাকে কি রকম যেন দারুণ ভালো লাগত। পরান, নন্দদের কাছে কথায় কথায় মার কথা বলতে ওর বুকে খুশি আঁক কাটত, ও কেমন গর্বে ফুলে ফুলে উঠত।

সেই মনোরম মা হঠাৎ একদিন মারা গেল। কেউ বুঝতে পারে নি, রসিক তো নয়ই। খেলছিল বাগানে, বাতাসীর সঙ্গে কি নিয়ে তর্ক হচ্ছিল, এমন সময় সূর্যর বাবা ডেকে নিয়ে গেল। ঘরে অনেক লোকের ভিড়। ঘরের মেঝেয় মা কেমন টান টান শুয়ে, পরনে সেই ডোরাকাটা সাদা নীল শাড়ি।

মৃত্যু সেই প্রথম দেখল রসিক, বুঝত না। মৃত্যু মৃত্যুই, আর বেশী কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় নি সে। মৃত্যু মানে, মার উধাও হয়ে যাওয়া হারিয়ে যাওয়া সে কথা সন্ধ্যে থেকে বুঝল। ডোরাকাটা শাড়ি পরে মা আর হাঁটছে না। তুলসী তলায় গড় হচ্ছে না, আদর করে খেতে ডাকছে না। মা যেন সব কিছু থেকে অপসৃত, সব কিছুতে অনুপস্থিত।

মৃত্যুর অন্য অর্থটা বুঝল কিন্তু পরের দিন থেকে।

রসিক যথারীতি খেলতে বেরিয়েছে। বিলকালীর থানে ছুটতে ছুটতে গিয়ে হাজির। তক্ষণি পরান, সূয্যি, ধরণী ওরা জমিয়ে খেলতে শুরু করেছিল। রসিক দূর থেকেই লক্ষ্য করেছে। কিন্তু ওকে হাঁপাতে হাঁপাতে নিকট হতে দেখে গোটা দলটা কি রকম ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এ ওর দিকে তাকাতে লাগল। কারুর মুখে কোন কথা নেই।

কি রে, খেলবি না? আয় ব্যাঙাচি ব্যাঙাচি খেলি। রসিক বলল

ওদের সকলের চোখে কেমন আতঙ্ক ফুটল, উঁ আঁ করে ওরা সাড়া দিল কিন্তু একজনও এগোল না।

রসিক একটু থামল, কি ব্যাপার ধরতে পারছিল না। শেষে ও এগিয়ে লতির হাত ধরল, চল রে আমরা আম্মা-বাড়ি খেলি।

রসিকের হাতের মধ্যেই লতি কেমন কেঁপে উঠল। হাত ছাড়িয়ে নিতে নিতে ওর চোখ দিয়ে জ্বালা ঝরে পড়ল।

এ্যাই রসো, তু উয়ার হাত ধরলি কেনে, ছুঁয়ে দিলি কেনে? পরান কেমন নির্মম মুখে জিজ্ঞেস করল।

কেনে, ছুঁলে কি হল, তুরাও তো ছুঁচ্ছিস্ ?

না, তুকে ছুঁতে নাই, তুর মা মরিছে, তুর দুষ ল্যাগেছে, তুরে ছুঁলে আমাদের ও দুষ লাগে।

হ, তুরে বুলেচে, দুষ লাগে, তুদের মা মরবে না, তখন ? ছুঁতে নাই,—বেশ করব ছুঁব, তুর কি ? আয়রে লতি, আমরা উই ঢিপিটায় বসে খেলব।

লতি একটু দ্বিধা করল তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, না, আজ খেলব না। তুমার দুষ কাটলে পর খেলব।

ওকে না বলতে দেখে অনেকেই বেশ তৃপ্তি পেয়েছিল। সকলে তাই এক স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, যাস্ নে, যাস্ নে, পালিয়ে আয়, উয়ার কাছে থাকিস নে।

লতি এক পা এক পা করে দলে ভিড়ে গেল। অদূরে দাঁড়িয়ে সবাই কেমন বিদ্রূপ নিয়ে, আতঙ্ক নিয়ে, মজা নিয়ে রসিকের দিকে তাকিয়ে রইল।

রসিকের বুকটা কি রকম মোচড় দিয়ে উঠল। নিজেকে বড় বিপন্ন, অবহেলিত, লাঞ্ছিত মনে হল। ও আর কিছু না বলে ঘরে ফিরে এলো।

দাওযায় নারাণ চুপচাপ খুঁটিতে গা দিয়ে বসে আছে। রুক্ষ রুক্ষ চেহারা। অন্যমনস্ক, গম্ভীর। রসিক কোন না বলে গাবগাছের তলায় গিয়ে বসল।

কতক্ষণ বসে ছিল খেয়াল নেই হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে চোখ চেপে ধরল। রসিক একটু ছটফটিয়ে উঠে থির হল।

কিছুক্ষণ পর বাতাসী পাশে বসে বলল, কি বুকা, বুলতে পারলে না।

রসিক কোন তর্কে না গিয়ে বলল, সরে বস্, আমায় ছুঁস্ নে।

কেনে ?

মা মরিছে, আমার দুষ ল্যাগেছে, তু ছুঁলে তুরও লাগবে।

হুঁ তুমায় বুলেচে, মাসীমা মরে সগ্গে গেছে, অমুন সিন্দুর বালা পরি মরলি, সতী হয়, সগ্গে যায়। ইয়াতে দুষের কি আছে ?

তা, উয়ারা যি বুলল ?

তুমাকে বুকা ঠাউরে বুলেচে। চল ঘুটিং খেলি, রঙিন ঘুটিং পেইচি।

রসিকের দ্বিধা কাটে না।—না রে, মাসীমা কি বুলবে।

তুমার মাথা। উঠ তো। বাতাসী রসিককে টেনে তুলে হাত ডোবার পাশে আমলকি তলার দিকে এগিয়ে গেল। ওখানে ওদের রান্নাবাড়ির

ঘর সংসার। ওরা সময় পেলেই একে অপরকে ডাক দিয়ে ওখানে ছুটে ছুটে পালিয়ে যায়।

মার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রসিকের অনেক অভিজ্ঞতা হল, অনেক কিছু বুঝতে শিখল, বাতাসীকে অনেক ঘনিষ্ঠ ভাবতে পারল। মার স্মৃতির সঙ্গে দৃশ্যটা এত নিবিড় ভাবে জড়িয়ে আছে, মার কথা বলতে ঐ দৃশ্যটা ছাড়া আর কিছুই মনে ভাসে না। মার কথায় বাতাসীর চিন্তটা বড় নিকট হয়।

সেদিন দাওয়ায় বসে বসে রসিকের এই সব নানান্ ঘটনার কথা মনে পড়ছিল। কত টুকরো টুকরো ঘটনা অথচ এতকাল সে সব স্মৃতির কোঠায় অম্লান হয়ে গোছনো ছিল। একটু নাড়া পড়তেই আপনা আপনি জীবন্ত হয়ে ওঠে।

সেই ঘটনাটা রসিকের আজো মনে পড়ে। সেবার খুব বন্যা হয়েছিল। বিলের সাঁকোটা পর্যন্ত ডুবে গেছে। জল কালীর থান ছুঁয়েছে। সকাল থেকেই বাপ ঘর ছাড়া। অন্য সকলের সঙ্গে সেও বাঁধের ধ্বস সামলাতে পশ্চিম পাড়ায় গেছে। বাঁধটা সামলাতে না পারলে মনোহরপুর গাঁ বিলের তলে চলে যাবে। তাই ঝাড় থেকে বাঁশ কাটা, পেছে পেছে মাটি বওয়া, খুঁটি পোতা, কোদাল চালানো—নানান্ কাজে সব ঘর থেকেই লোক লেগেছে।

রসিকের হাঁটুর ওপর একটা বিষফোঁড়া হয়েছে, ও সেদিন যেতে পারে নি। দাওয়ায় চাটাই পেতে শুয়ে কাতরাচ্ছে। এমন সময় দেখে, বাতাসী উঠোনে এক পায়ে লাফাচ্ছে আর বলছে— ল্যাঙ ল্যাঙ ল্যাঙ বিষে লিল ঠ্যাং।

রসিক প্রথমে বুঝতে পারেনি কিন্তু বাতাসীর চোখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। বাতাসী লাফাতে লাফাতে ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। মাঝে মাঝে মাটিতে বসে পড়ে হাঁটুতে হাত বুলাচ্ছে, আঃ উঃ করে কাতরাচ্ছে আবার উঠে হাসতে হাসতে লাফাচ্ছে, আর বলছে ল্যাঙ ল্যাঙ ল্যাঙ, হাঁটু ফোলা ব্যাঙ।

রসিকের গা পিত্তি জ্বলে যায়, হাঁকড়ে ওঠে, বাতাসী, তুর মুড়া ছিঁড়ি লিব, পালা বুলছি, উঠলে তুর বদন বিগড়ে দিব।

বাতাসী জানে, রসিক যতই তড়পাক, আজ আর ওকে উঠতে হচ্ছে না। ঠোঁট উল্টে ভেঙচে বলে, আসো না দ্যাখ, তুমার নাক খামচে লিব। আবার ভেঙচি কাটে, ছড়া কেটে লাফাতে থাকে।

রসিক আর রাগ সামলাতে পারল না, নিজের ব্যথার কথা ভুলে ঝাঁপিয়ে উঠোনে নামল।

এর জন্যে বাতাসী কিন্তু মোটেই প্রস্তুত ছিল না। রসিক যে উঠে আসতে পারবে ও ভাবতেই পারে নি। তাড়াতাড়ি ছুটে পালাতে গিয়ে গরু বাঁধা খুঁটোতে হোঁচট খেয়ে পড়ল।

রসিক ছুটে গিয়ে ওর ঘাড় খামচে ধরল। তারপর উপুড় করে দেখে বাতাসীর ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে। নয় দশ বছরের কিশোরীর ঠোঁটের রক্তে বুক ভেসে যাচ্ছে। বাতাসী কিন্তু ভয়ে কাঁদতে পারছে না। যন্ত্রণায় ওর মুখটা শুধু কুঁকড়ে উঠছে। ওর অবস্থা দেখে রসিক ঘাবড়ে যায়। কি করবে ঠিক করতে না পেরে ছুটে এক ঘটি জল এনে ওর চোখে মুখে ঝাপটা দিতে থাকে, গামছা এনে ওর মুখ মুছে দেয় কিন্তু রক্ত পড়া বন্ধ হয় না। হঠাৎ ওর নিজের উপায়টা মনে পড়ে, ও বাতাসীর ঠোঁটটা চুষে চুষে রক্ত থামাতে চাইল।

বাতাসী অবাক হলেও বাধা দেয় না, তার বয়সে তেমন সচেতনতা ওর জাগে নি। বাতাসী চোখ বুজে যন্ত্রণাটা সহ্য করতে চেষ্টা করে, ওর ঠোঁটটা একটু করে ফ্যাকাশে হয়ে আসে, রক্ত পড়াটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়। তখন রসিকের খেয়াল হল তার হাঁটুটা টাটাচ্ছে।

ও কোন রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দাওয়ায় উঠে শুয়ে পড়ল আর বাতাসী অপরাধী অপরাধী চোখে এক টুকরো উনোনের মাটি গুলে বিষ ফোড়াটার চারপাশে বুলিয়ে দিতে লাগল। রসিকের চোখ মুখের অবস্থা দেখে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল, একটু ভয়ও করছিল, ও আর টুঁ শব্দটি করে নি।

অত যন্ত্রণার মধ্যে বাতাসীর ভাব দেখে রসিকের মজা লাগছিল। ও এত রেগে গিয়েছিল, হয়তো মারই লাগাত কিন্তু পলায়নপরা বাতাসীকে দেখে বাতাসীর জলজলে রক্ত দেখে ও সব ভুলে গেল, বাতাসীর জন্য ওর ভীষণ মায়া হল। সেদিনকার সেই ভেংচি কাটার জন্য রসিক আর ওকে কিছু বলে নি।

দাওয়ায় হাতে ভর দিয়ে বসে রসিকের এই সব হাজার স্মৃতি মনে পড়ছিল। কখন বাতাসী ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে ও বুঝতে পারেনি। যৌবনবতী বাতাসীর মুখে কিশোরীর চপলতা ফুটে উঠেছে। ও রসিকের মাটিতে ভর দেওয়া হাতটা আচমকা টেনে নিল আর রসিক দাওয়ার ওপরে চিৎপাত।

বাতাসীর খিল খিল হাসিতে রসিক মুখ ফিরিয়ে দেখে, বাতাসী ছলকে ছলকে হাসছে। হাসির দমকে ওর শরীরটা দুলছে, ও হাসি সামলাতে পারছিল না। ও একটা আকাশী শাড়ি পরেছে, চুলটা টান টান করে বাঁধা, কপালে একটা কাঁচ-পোকার টিপ। তার ভরা যৌবনে ওতেই ওকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। বাতাসীকে ফুলে ফুলে হাসতে দেখে রসিকও হেসে ফেলল।

বাতাসী রসিকের পাশে বসতে বসতে বলল, কার নাম জপছিলে গো?

বাতাসীর হাসি-ফোটা চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে রসিক বলল, তুর।

বাতাসী ঠোঁট উল্টে বলল, হেই, মিছ্যা বুল না।

সত্যি, তু বিশ্বেস কর, তুর কথাই ভাবছিলেম। তারপর বাতাসীর ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে বলল, হেই বাতাসী, তুর ঠোঁঠের সিই কাটা দাগটা এখুনও মিলাই নাই—দেখি?

বাতাসী চোখে ভ্রুকুটি হেনে বলল, হেই গো. তুমি এট্টুও বদলাও নাই, তুমার স্বভাব তেমুনি আছে। বলে উঠে পালাতে গেল কিন্তু তার আগেই রসিক ওর হাতটা ধরে ফেলেছে।

বুল না, নজ্জা কিসের, সি বেলায় তো তু নজ্জা করিস নাই?

যাও—বলে বাতাসী মুখ ফিরিয়ে নিল।

রসিক ওর থুতনিটা ধরে মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়ে আনল। বাতাসী চোখে জ্বালা ফুটিয়ে ওর চোখের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নিল। তার সেই আবেশঘন লাজুক লাজুক মুখটা একটু তুলে রসিক ঠোঁটের সেই কাটা দাগটা কোথাও দেখতে পেল না, বরং দেখল, নিচের ঠোঁটের মাঝে একটা টোল নিয়ে ঠোঁটটা রসালো কোয়ার মতো ফুলে উঠেছে।

রসিক বাতাসীর ঠোঁটের ওপর আঙুল বুলিয়ে বলল, বাতাসী, তুকে বড় সোন্দর লাগছে।

বাতাসীর ঠোঁটটা থরথর করে কেঁপে উঠল, চোখের পাতা তুলে রসিককে' একটু দেখল, ওর দৃষ্টি ঘন হয়ে এলো।

রসিক ওর চোখে চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ওর চোখের ওপর আলতো ভাবে ফুঁ দিয়ে বলল, তু পাগলি বটে!

সেদিন বাতাসীকে রসিক অনেক কথা বলেছিল। বাবাজীর কথা, সাধন মাঝির কথা, গানের দল গড়ার কথা, তার স্বপ্নের কথা। কিন্তু কেন যেন সে মতিঠাকরুণের কথা আর নয়নের কথা বলতে পারল না। ওর বলতে ঠিক ইচ্ছে হল না।

বাতাসী দারুণ বিস্ময়ে রসিকের কথাগুলো শুনছিল। কথাগুলো তার কাছে খুব নতুন নতুন ঠেকছিল। ও ভাবতেই পারছিল না, গতর না খাটিয়ে মানুষ কি করে রোজগার করবে?

বাতাসীর কৌতূহল দেখে রসিক বেশ বিজ্ঞ লোকের মতো তাকে বোঝাতে লাগল, কেনে, তুরা পূজার সময, বিহ্যা সাধিব সুময়, গাজন মেলার সুময় কবি, যাত্রা, বোলান শুনিস নাই? উয়ারা কি বিনি পযসায ট্যাকের কড়ি খসায়ে গান কবতি আসে? হুঁ, উয়াদেব ফি রেতে বাঁধা বেট আছে, তার ওপর থাকা খাওয়া, বিড়িটা তামুকটা যুগান দিতি হয়। আর তেমুন দল হলে ফি বেতে তিনশো চারশো পয্যন্ত দর ওঠে। আব গান শুনে দু' দশ পাঁচ খুশ-ফেরীও পড়ে। তাঅলে বুল, গানে পয়সা হবেনি কেনে?

বাতাসী হেসে বলে, হেই, উদেব সাথি তুলনা, অরা তো ভাড়া খাটে। তুমায় কেডা টাকা দি ডাকবে গো? উয়াদের কতটি তোডজোড—বাজিয়ে, গাইয়ে, নাচিয়ে, উযাবা কত ভালো গান করে আর তুমার গান তো আমি জানি, তুমাব সি গান কেডা পয়সা দি শুনবে?

বাতাসীব কথা শুনে রসিকেব বেশ মজা লাগছিল।—হ দেখিস্ আমার গান শুনতি মানুষে কেমন ভিড় করে। সাধন মাঝিব নাম তো শুনছিস, উয়ার ঠেঁয় আমাব তালিম লেওয়া, উযার জুটি আমি, ঢেদ্দিন উযার কাছে শিখছি, সি কি সব মিছে হবে? দেখিস্ ক'দিনেই দল হয়ে যাবে। রেতে এই দাওয়ায় বৈঠক চলবে তাপর আসর বসবে।

বাতাসীর মুখ থেকে এই গানের খবর ওর মা শুনল, মার কান থেকে পাঁচ কান। আবার একটা নতুন খবরে রাজবংশী পাডাটা মেতে উঠল। রসিককে নিয়ে আবার আলোচনা শুরু হল।

অনেকেই রসিকের গানের কথা বলে প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা শোনাল অর্থাৎ তাবা শুনেছে সেই গান। আবার কেউ কেউ মুখ বেঁকাল, হ রাখ রাখ, উ সব চাল আমাদের ঢের দেখ্যা আছে। সিদিনের 'রসে' আবার গান মাস্টর হবে!

কিন্তু একদিন সত্যি সত্যিই রসিক গান শুরু করল। যারা প্রশংসা করেছিল আর যারা নিন্দে করেছিল সকলেই সেই সন্ধ্যায় ওর দাওয়ায় এসে জুটল। রসিক বিনা বাজনায় আলকাপের এক একটা গান গেয়ে ছিদাম, পরান, নন্দদের বোঝাচ্ছিল। আর হাতে তাল দিয়ে সোম ফাঁক, ঢিমে জলদের ব্যাপার বোঝাচ্ছিল।

রসিকের গলা দিয়ে যে অমন সুর বেরোতে পারে এটা কেউ ধারনাই করতে পারে নি। সকলেই একটা মজা দেখতে এসেছিল কিন্তু প্রথম গানেই ওরা জমে গেল। ওরা পয়সা দিয়ে অনেক দল এনেছে, অনেকের গান শুনেছে, কিন্তু এমন গান খুব কমই শুনেছে। তাই গান শেষ হতেই বাহবার ফোয়ারা ছুটল, চতুর্দিকে থেকে তাগিদ—রসিক, রসিকভাই, লারানপো আর একটা—আর একটা ধর না কেনে?

এরপর দল গড়তে আর অসুবিধে হয়নি। বুড়োরাও মাথা নেড়ে বলেছিল, লিজেদের দল হবে ই কি কম কথা? হুই কুথা কুথা থেকি কত তেলায়ি এক রেত গানের জন্যি ধন্না দিতি হয়। এ বাপু লিজেদের দল, সখটা আশটা মিটবে, সাঁঝবেলায় ই লিয়ে বসা যাবে—উই তাড়ি রাঁঢ় লিশা থেকি ইটা ভালো, রেতে গান গা, ফূর্তি কর, দিনে জমি জিরেত লিয়ে মাতি থাক, কুনো কষ্ট দুঃখু থাকবে না। হ, লারানপো ই একটা কামের মতু কাম শিখ্যা এইচে!

চাঁদা উঠতে দেরী হল না। পরান, ছিদামের দল দু' মাসের মধ্যে হারমোনিয়ম, ডুগীর টাকা তুলে ফেলল।

তিন মাসের মাথায় রসিক যেদিন ধুলিয়ান থেকে বাজনা দুটো কিনে আনল সেদিন ওর ভিটেয় লোক ধরে না। রসিকরা ঠিক করেছিল এই দিন একটা ছোট আসর বসাবে কিন্তু সেই আসরের চেহারাটা যে অমন হবে ওরা ভাবতেই পারে নি। রাজবংশীরা তো ছিলই তাছাড়া তিলিপাড়া, কলুপাড়া, কুমোরপাড়া থেকে লোক এসেছে। পরান দে-বাবুদের বাড়ি থেকে একটা সামিয়ানা নিয়ে এসে টাঙিয়েছে। চৌধুরীদের বাড়ি থেকে ছিদাম একটা হ্যাজাগ বাতি এনে জেলেছে। উঠোনটায় লোক ধরছিল না বলে বাতাসীদের বাড়ির পাটকাঠির বেড়াটা তুলে দিয়ে রসিকের উঠোনের সঙ্গে এক করে দেওয়া হল। মেয়েরা ঐদিকটায় বসল। জায়গাটা বেশ গানের আসর আসর লাগছে।

রসিক নিয়েছে হারমোনিয়ম আর ডুগী তবলাটা দিয়েছে নন্দকে। নন্দ একটু আধটু জানত, রসিক নিজে সাহস দিয়েছে, এ তো ঘরোয়া আসর, অত ভুল-টুল ভাবলে চলে না। ছিদাম, হারান, রুপা, ননী ওরা ধুয়োদারদের মতো রসিকের দু'পাশে বসেছে। ছিদামের ভাই হারা আর চিন্তু ছোকরা সেজেছে। আলকাপ শুনে শুনে ওদের একটা ধারণা ছিলই। রসিক সেটা নিজের মনের মতো ঠিক করে নিয়েছে।

রসিক পাকা বাজিয়ের মতো হারমোনিয়মে একটা গৎ বাজিয়ে গান ধরল,

ভগবান যারে মারিতে পারে
সেই তো যাবে স্বরগ পুরে।
তুমিই কৃষ্ণ তুমি ভগবান
জগতের সবই তুমারি ত দান।
আমি তুমায় পূজা করি
ভব সমুদ্র যেন যাই গো তরি।

আজ হয়তো এত শ্রোতা দেখেই ছিদামরা মেতে উঠেছে, ঠিক ইশারা মতো ধুয়া ধরছে। চিন্তু, হারা 'তুমিই কৃষ্ণ তুমি ভগবান' গাইতে গাইতে ঘুরে ঘুরে নাচছে, 'আমি তোমায় পূজা করি' গাওয়ার সাথে সাথে প্রণাম করার ভঙ্গীতে নিচু হচ্ছে আবার নাচতে নাচতে উঠে দাঁড়াচ্ছে। রসিক নিজের হাতে ওদের সাজিয়েছে। দেখতেও বেশ লাগছে। ওরা মেয়েদের ঢংও বেশ নকল করতে পারে আর তাই নিয়ে বেশ হাসির হাওয়া বইছে, দু' আনা চার আনা ফেরীও দেখাল কেউ কেউ।

একটা দারুন উন্মাদনার মধ্যে গান শেষ হল। সকলে আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ল। কেউ কেউ উঠে এসে আগ্রহাতিশয্যে রসিককে জড়িয়ে ধরল, দর্শকদের আনন্দ দেখে ছিদামরা আসরেই রসিককে কাঁধে তুলে ক'পাক নেচে নিল। প্রথম দিনের ঘরোয়া আসরেই রসিকের দলের নাম ছড়িয়ে পড়ল।

সেদিন খেতে বসতে বসতে রসিকের অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। বাতাসী-দের দাওয়ায় উঠে দেখল বাতাসী একলা বসে আছে।

রসিক হাত মুখ ধুয়ে এসে খেতে বসল। আসন পেতে জল ছিটিয়ে খাওয়ার জায়গা করা হয়েছে।

রসিককে ভাত বেড়ে দিয়ে বাতাসী ওর সামনে এসে বসল। ওর মুখ-চোখে দারুণ উত্তেজনা ফেটে পড়েছে। রসিককে খেতে দিয়ে বলল, রসোদা, তুমি এত ভালো গান করতি জানো! তুমার কি গলা, উয়ারা সকলে তুমার গান শুনি তুমার খুব নাম করছেল।

উয়ারা, কারা রে?

বাতাসী একটু দুষ্টু হাসি হেসে বলল, ঐ যে তুমার সব মুনের মানুষরা—লতি, রেণু, সীতেরা। লতি তুমাকে দেখি দেখি আমাকে জড়ায় ধরছেল, বলছেল, আমার কি পুড়া কপাল রে, আমার বিহ্যা না হলি ভালো হোত, লাগরটি হাত ছাড়া হোত না! আরো সব কত কি বলছেল—।

রসিক খেতে খেতে বলল, হঁ্যা রে, ছোটুবেলায় তুর সাথি লতির খুব ঝগড়া ছেল, না?

বাতাসী একটু হেসে বলল, হেই, সি তো তুমার ল্যাগে।

হ, উ আমার বউ হতি চাইত আর সি ল্যাগেই তুর সঙ্গি কাজিয়া।

তুমিও কম ছিলে না—উয়ার দিকেই তুমার যত্ত টান। কুলটি, জামটি প্যাড়ে আগুতে উকেই দিতে, আমার কথা মুনেই থাকত না।

তাই নাকি রে, তা তো হবেই, তুর যা কাঁদন ছেল।

হ, আমার কাঁদন আর উয়ার খুব সুহাগ, আস্‌লে উয়ার অঙটি তুমার মুন কাড়ত, আমার ময়লা অঙ তুমার পসন্দ হোত না।

বাতাসীর রাগ দেখে রসিক হাসতে থাকে, বলে, তুর বয়স হল কিন্তু তুর স্বভাবটি তেমুনি রইল। কাজিয়া করতি পেলি আর তু ছাড়িস না। তারপর একটু থেমে আবার বলল; উয়াদের কথা রাখ্‌, তুর কথা বুল, গান তুর কেমুন লাগছে? তুর কথাটি আসল।

বাতাসী একটু রাঙা হয়ে মুখ ঘুরিয়ে বলল, আমি আর কি বলব, উ সব গান-টান কিছুই বুঝি না, অমুন বুদ্ধি শুদ্ধিও নাই। তা মুন বলে, দিনে খেত খামারও দিখা ভালো, উ তো খারাপ কাম লয়।

রসিক ওর দিকে তাকিয়ে বলল, বেশ তো, তু যদি উয়াতে সুখী হোস, তাহলি তাই হবে। দিনে খেত দেখব, আর রেতে গান—তাপর পয়সা হলি উ সব ছ্যাড়ে দিব, কেমুন?

সেদিন খাওয়া দাওয়ার পর অনেকক্ষণ ওরা নানান্ গল্পে মেতে উঠেছিল। উভয়ের মনেই খুশির বন্যা বইছিল। রসিক তার প্রথম দিনের সাফল্যকে শুভ সূচনা বলে ভাবতে পারল, ওর নিজের ওপর বিশ্বাস জন্মাল, ও কেমন এক তৃপ্তিতে বাতাসীকে তার অনেক কল্পনার কথাগুলো বলে গেল। বলে গেল, হ রে, মাঝি বুলত,

এট্টুতে মুন উঠাস না,
লজর ছোট করলি, 'পরে,
হাঁটু জলেয় জগত চিনা
আর উঁচু লজর হলি 'পরে
সমুদ্দুরেও তল পাবি না।

ইই যি সক্কলে বাহবা বাহবা দিল, লারানপো, অসিক ভাই বুলে চিল্লালো, ইয়াতে সুখ পেলি চলবে না, ই সব বাধা, মুন ডরায়। যখুন দশ বিশটো গাঁয়ের মানুষ এক ডাকে আমারে চিনবে, অসিক মাস্টারের গান শুনতি লোক ঝেঁটিয়ে আসবে, বুঝদার মানুষ উয়ার ছড়া শুনি বাহবা দিবে তখুন গা সুখ। তখুন বুঝব কিছু হচ্ছে।

ই তো শুধু গান লয়, ইয়ার মধ্যি হক্ কথা আছে, বাছবিচার আছে, মুনের দ্বন্দ্ব মিটার যুক্তি আছে—ই ভিতরের কথাটো মানুষে ধরতি পারলে, গান উৎরালো লয়তো ই বাজারী খিস্তি খেউড় খেম্‌টা ই যি সিই করতি পারে, ইয়ার ল্যাগে অদ্দিন গান শিখি নাই, উয়ার জন্যি সাধন মাঝি মুন দি তালিম দেয় নাই।

বলতে বলতে রসিকের চোখ মুখ জ্বল জ্বল করে উত্তেজনায় জ্বলছিল। ও কল্পনায় সেই সব দিন দেখছিল। একটা নিকানো গোছানো বাড়ি। বাইরে গান ঘর, ডুগী তবলা, হারমোনিয়ম, ঢোলক, ডুবকি সব সাজানো। নিয়ম করে তালিম চলবে তার সাথে একটু একটু পড়া লিখা।

মাঝি বলত, গানে কি হবে রে, সুরটো তো সুতোর মতু, ধরি রাখে, কথাটো আসল, যি গাইবে আর যি শুনবে, সুরটো উয়াদের মিলায় দেয় আর কথাটো ভাবটো ভিত্‌রে পাড়ি জমায়, যেমুন ভাব তার তেমুন কদর, উয়ার ল্যাগে ভিত্‌রে কুটকুটি তাই নাম শুনলি মানুষে ছুটি আসে, সি নাম ডাকে মানুষ মজে।

রসিকের মনে সাধন মাঝির মতো বড় বড় বই পড়ার ইচ্ছে হয়। সময়ে গান সময়ে পড়াশুনা। কেমন পুঁথির মধ্যে সেঁদিয়ে থাকা, অন্য কোনদিকে খেয়াল নেই। একটু গুছিয়ে নিতে পারলেই শুরু করবে। করতে করতেই

হবে। তারপর পাল্লা। রসিক ছাড়বে না, গোমনি, লম্বোদর, ঝাঁকসু—কারুর চেয়ে ও কম নয়, ও লড়বে, সাধন মাঝির জুটি সে, গাঁ গেরস্থের বাহবা নিয়ে সুখ নেই।

বাতাসী অবাক হয়ে শোনে। রসিকের কল্পনায় ও-ও কেমন বুঁদ হয়ে যায়। ও-ও মাথা নেড়ে সায় দেয়, কখনো বলে, তুমার হবে, দেখো তুমার হবে।

সেদিন সেই নিস্তব্ধ রাতে, কল্পনায় ভাসতে ভাসতে রসিক অনেক সুখকর অনুভূতিতে লালিত হল এবং সেই রকম আবেগে চাঁদের আলোয় থৈ থৈ বাতাসীর একটা হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে বলল, যিদিন আমার দলের বউনি হবে, ভিন্ গাঁ থেকি খাতির লিয়ে আসব, বুল সিদিন তুর কি চাই, তুর মুনের মতু কিছু দিতি পারলে আমার সুখ, বুল ?

রসিকের অমন ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আবেগঘন নিবিড়তায় বাতাসীর মন ভরে ওঠে। ও কি চাইবে ? ওর সব চাওয়া পাওয়া রসিককে নিয়ে, রসিকের সুখেই ওর সুখ। তাই অস্পষ্ট স্বরে বলে, আমার লিজের কিছু চাওয়া নাই, তুমার নাম হলি, তুমার সুখ হলি আমার সুখ, আর কিছু চাই না। '

রসিকের এতে মন ভরে না। বাতাসীকে একটু নিবিড় ভাবে কাছে টেনে ওর চোখে মুখে আঙুল বুলিয়ে বলে, না বুল, তুর তো লিজের কিছু সখ আছে, কিছু বাসনা আছে, বুল না, আমার কাছে লজ্জা কিসের ? তুকে কিছু দিতে আমারও তো মুন চায় বুল ?

রসিকের বুকের কাছে মুখ লুকিয়ে রসিকের আদরে একটু রাঙা হয়ে অতি সঙ্কোচে বাতাসী বলে, একটো বড় সখ ছেল, উই লতির মতু লাল পাথরের নাকছাবি পরব। তুমার যদি মুন চায় তাঅলে আমায় অমন একটো লাল পাথরের নাকছাবি দিও, কথা বুললে জ্বলি জ্বলি ওঠে !

বাতাসীর বলার ঢঙে রসিকের মুখে খুশির বন্যা বয়ে যায়। ও দু'হাতের আঁজলায় বাতাসীর মুখটা তুলে ধরে, অনেক আদর করতে করতে বলে, তুর অত সখ, লাল পাথরের নাকছাবি, কথা বুললে জ্বলি জ্বলি ওঠে, হাই এত্তো জানিস, বুক জ্বালুনি না হলি তুদের সুখ হয় না, না ? তুদের কথায় আমরা জ্বলি জ্বলি মরি, ইয়াতে তুদের সুখ। বেশ আমার পেরথম বায়নায় তুর বায়না মিটবে, তুকে শহর থেকে একটো লাল পাথরের নাকছাবি আনি দেব।

তারপর বাতাসীর চোখে চোখ বুলিয়ে বলল, তা মেয়ে, কুন্ মানুষের বুক জ্বালাবি বুল তো, কথায় কথায় বুক জ্বলবে, সি মানুষটো কে বটে ?

বাতাসী কপট রাগে মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে, হেই, মানুষ আবার কে, ও এমনি কথার কথা!

তা বটে, ও তো কথার কথা, তা মেয়ে, কি করি কথা বুললে জ্বলি জ্বলি ওঠে, দেখ্‌তি বড় সাধ, দেখা না?

যাও—বলে রসিককে ঠেলে রাগ দেখিয়ে বাতাসী ছিটকে পালায়।

বাতাসী বাতাসী—বলে রসিক বার কয় ডাকে, বাতাসী আর ফেরে না।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত রসিক, বাতাসীর চোখে ঘুম নামে না। রসিক তার কল্পনায় ভেসে চলে আর বাতাসী তার বহুদিনের সাধ সুখের কথায়, রসিকের আদরে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। উভয়ের মনেই সুখের একটা চেহারা স্পষ্ট হতে থাকে।

সেই রাতের নিবিড়তার মধ্যে চালতা কি ফলসা গাছে বসে একটা পাখি কেমন সুর করে ডেকে চলেছিল—পিউ পিউ পিউ। এই পাখির ডাক শুনলেই বাতাসীর বুকটা কেমন শির শির করে ওঠে। ওর আর কিছু ভালো লাগে না, কিচ্ছু না। কেবল চুপচাপ শুয়ে বালিশে মুখ ঢেকে ঐ ডাক শুনে সুখ। ঐ পাগল করা ডাকে অনেক পুরনো কথা, সুখের কথা থেকে থেকে মনে পড়ে। তার স্মৃতিতে, তার ভাবনায় তলিয়ে গিয়ে সুখ।

রসিকের কাছ থেকে পালিয়ে এসে বাতাসী বালিশ আঁকড়ে গড়িয়ে পড়ল। বাইরে মাধবী ঝোপ থেকে কি রকম এক মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল। জানালা দিয়ে ঘরের মেঝেয়, দেয়ালে, বাতাসীর শরীরে চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়েছিল। সেই নির্ঘুম তন্ময়তার মধ্যে বাতাসী আপন বুকের মধ্যে পিউ পাখির ডাক শুনতে পেল। বুকের মাঝে ডানা গুটিয়ে পাখিটা সুর করে ডাকছিল, পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা। এবং রসিকের আদরে লালিত তার শরীরে, রক্তে, অনুভূতিতে সেই ডাকের প্রতিধ্বনি জাগছিল: সেই কোন্ শৈশবে রসিকের আদর সোহাগের স্মৃতিতে সে আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছিল।

গা-টা শির শির করে উঠছিল বাতাসীর। ওর সবটুকু যেন কি এক প্রত্যাশায় ছটফট করছিল। রসিকের একটু আদরে তার শরীরের সব অনুভূতির

তারে বিচিত্র সুরে ঝংকার উঠেছিল, মন মাতানো সুরে সে সব বেজে উঠেছিল। সেই হারিয়ে যাওয়া কৈশোরে ঘাসবনে লুটিয়ে পড়ে রসিকের আদর খাওয়ার সুখ একটু একটু করে স্পষ্ট হচ্ছিল। বাতাসী চাঁদের আলোয় বুক ভাসিয়ে, মাধবী লতার গন্ধে, পিউ পাখির গানে সেই সব রঙিন দিনগুলোর সাড়া শব্দ পেল।

সকাল সকাল রসিক অন্য সব ছেলের সঙ্গে মাঠে গরু চরাতে যেত। গরু চরানোর ফাঁকে ফাঁকে ফল পাকুড় পাড়া, গালগল্প করা, কিংবা মোষের পিঠে চড়ে বোলানের গান ধরে ওদের সময় কাটত। আর একটু বেলা বাড়লে বাতাসীরা হেঁসো হাতে ঘাস কাটতে বেরোত। তারপর ফিরতি পথে ওদের দেখা হোত আর শুরু হোত হুটোপুটি, হুডোহুড়ি কি হেড়েগুড়ো খেলা। কেমন যেন নেশায় পেয়েছিল ওদের। গরু চরিয়ে কি ঘাস কেটে ওদের দেখা হোতই, ওর জন্যে ওরা যেন প্রতীক্ষা করে বসে থাকত। ওদের মন পড়ে থাকত সেই খেলার ফাঁকে ফাঁকে ছুটোছুটি, লুটোপুটি হুল্লোড়ের মধ্যে।

রসিকের গাঁ ছাড়ার ক'দিন আগেকার কথা। সেদিন ওরা চাঁদমারীর মাঠে ছো ছো খেলছিল। লতি জবুবুড়ি হয়েছে, চোখ বাঁধা, হাতে একগাছা লাঠি। একটা উঁচু চিবিতে ও বসে আছে আর সবাই, রসিক বাতাসী ওরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাঠ ভর্তি বনতুলসীর ঝোপে ঝাড়ে গা ঢেকে লুকিয়ে আছে। এমন সময় ডাক পড়ল, ছোঁ ছো। এ ঝোপ 'সে ঝোপ, সব মাঠ জুড়ে সেই ছোঁ ছো ডাকের বন্যা। লতি লাঠি হাতে এ ঝোপ পেটাচ্ছে, সে ঝোপ হাতড়াচ্ছে আর তার ফাঁকে ছেলেমেয়েরা ঝোপ পাল্টাচ্ছে আর খুক খুক, হি হি করে হাসছে। ডাক দিচ্ছে ছোঁ ছো, ছোঁ ছো।

রসিক অত বুঝতে পারে নি, ঝোপ পাল্টাতে গিয়ে বাতাসীর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখী টক্কর। লতি কাছেই ছিল, লতির হাতের লাঠিগাছা তখন 'ঝোপ হাতড়াচ্ছিল। ওরা আর টুঁ শব্দটি করতে পারে নি। রসিক বাতাসীকে জড়িয়ে পাশের ঝোপটায় গড়িয়ে পড়েছিল। ওরা নিশ্বাস বন্ধ করে লুকিয়েছিল, পাছে লতি ধরতে পারে। অন্য ঝোপে ছোঁ ছো ডাক পড়তে লতি একটু একটু করে

দূরে সরে যাচ্ছিল আর রসিক বাতাসী বনতুলসীর টানা পাতার আড়ালে শরীর ঢেকে জুল জুল করে তাকাচ্ছিল। নিশ্বাস চেপে বাতাসীকে বুকে জড়িয়ে রসিক উত্তেজনায় সেদিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে ছিল। লতিকে এগিয়ে যেতে দেখে সে ঠোঁট কেটে হাসল, সুখে নিশ্চিন্তে হাত ছড়িয়ে এলিয়ে পড়ল।

এতক্ষণ অন্য কিছু দেখার মতো মন ছিল না রসিকের, শুধু আশঙ্কা, যদি লতি ছুঁয়ে দেয়। লতি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন কিছু অনুভব করল সে। তার বুক মুখ ছুঁয়ে গরম নিশ্বাসের স্পর্শ পেল এবং তাকিলে দেখল, বাতাসী তাকে কেমন আঁকড়ে জড়িয়ে আছে। রসিকের ঘাড়ে পাঁজরে বাতাসীর নখের জ্বালা। বাতাসী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কেটে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে, ওর ফোলা ফোলা ঠোঁটে দাঁতের কাটা কাটা দাগ পড়েছে।

ও একটু অবাক হয়েই বাতাসীর গালটা টিপে দিয়ে ফিস ফিস গলায় ডাক দিল, এ্যই বাতাসী, তুর কি হলছে?

বাতাসী কথা বলে না, কেমন আবেশ নিয়ে তাকায়। সেই কিশোর শরীরেই রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করে উঠে। রসিকের শরীরের মধ্যে কিসের একটা দাপাদাপি শুরু হয়। ও বাতাসীর ঘাড়ে নিজের মুখটা ঘষতে ঘষতে বলে, এ্যই, তু অমুন করছিস কেনে?

ঘাড়ে রসিকের ঠোঁটের মুখের স্পর্শে বাতাসীর শরীরটা শির শিব করে ওঠে। কান জ্বালা করতে থাকে। একটা সুড়সুড়ির আমেজ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। ও বনতুলসীর আড়ালে একটু ছটফটিয়ে ওঠে, শেষে রসিকের বুকে মুখ ঘষে সুড়সুড়ি ভাবটা কাটাতে চেষ্টা করে।

রসিকের কি যেন হয়। ও আচমকা বাতাসীর মুখটা তুলে ধরে চটাস করে একটা চুমো খায়। বাতাসীর শরীরটা তির্ তির্ করে কেঁপে ওঠে। ওর বুকের মধ্যে একটা খুশির নাচন শুরু হয়। আবেশে ওর হাত পা সর্বস্ব কেমন শিথিল হয়ে পড়ে। ও রসিকের উষ্ণতায় ভাসতে ভাসতে স্থির হয়ে যায়।

ওর রক্তে রসিকের ঠোঁটের জ্বালা, ওর ঠোঁট নিশ পিশ করে উঠছিল। ওর কুমারী শরীরে ভিন্ন কিছুর তোলপাড় শুরু হয়, ও সেই আবর্তে তলিয়ে যেতে যেতে বন বাদাড়ের গন্ধ, ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ, ঘাস ফুলের গন্ধ পেল, শুনতে পেল টিটি পাখির মাঠ ভারানো ডাক—টিটির টি টি টি। ওর বুকের মধ্যেও একটা লুকানো পাখির ডাক শোনা গেল, ও একনাগাড়ে কুক্ দিয়ে চলেছে, কিসের উদ্দেশ্যে সে ডাক কে জানে, সমস্ত স্নায়ুঝিল্লিতে তার সাড়া, সব কিছু ঝনঝনিয়ে

ওঠে। এই রকম এক অবলুপ্তির মধ্যে রসিক ওকে বুকে জড়িয়ে হঠাৎ জানান দিল, ছোঁ ছো, ছোঁ ছো।

লতি লাঠি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এগিয়ে আসছে। ওরা মুহূর্তে উঠে পড়ে। খিল খিল করে হাসতে হাসতে ঝোপ পাল্টায়, বনতুলসীর ঝোপে গড়িয়ে পড়ে। অন্য ঝোপ থেকে ডাক পড়তে শুরু হয়, ছোঁ ছো, ছোঁ ছো।

বাতাসী চোখ বুজলেই আজো সেই ডাক শুনতে পায়, সেই ঝোপ পাল্টানো খিল খিল হাসি, সাড়া শব্দ গন্ধে তলিয়ে যায়, সেই বয়ঃসন্ধিকালে তার কুমারী শরীরে নানান্ প্রতিক্রিয়া, বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে কেমন যেন সুখ পায়, কেমন এক আবেশে ওর চোখ বন্ধ হয়ে আসে। সেই কৈশোরের স্মৃতি তার সঞ্চয়ের অনেকখানি জুড়ে আছে, একটু নাড়া খেলেই সেখানে তরঙ্গ ওঠে, প্রতিটি মুহূর্ত যেন জীবন্ত বলে মনে হয়।

সেদিন রাতে রসিকের কাছ থেকে আসার পর চাঁদের আলোয় ভাসতে ভাসতে, পিউ পাখির গানে গানে বাতাসীর ঐ সব কথা মনে পড়ছিল। সেই সব পুরানো স্মৃতির সুখে ভাসতে ভাসতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে সে।

আর মাস দুই পর রসিকের দলের প্রকাণ্ড আসর বসল। হিলোড়া গ্রামে শ্যামসুন্দরের মেলায় তাদের ডাক পড়েছে। পাশের গাঁ আর প্রথম গান বলেই রসিক কোন বায়না নিল না, শুধু খাওয়া আর বিড়ি তামাকের বদলে গান গাওয়ার সম্মতি জানাল।

ছিদাম রসিককে বলেছিল, তুমি বাপু কিছু টাকা অন্তত চাও, দলের বউনিটা হোক।

রসিক হেসে বলেছিল, না রে, এখুন টাকা চাওয়ার সুময় হয় নাই। উই যে দশজনার আসরে গান গাইতি পারছি, ইয়াই অনেক। মেলায় কত লোক আসবে, নাম করতি পারলি দেখবি টাকা চাইতি হবে না, ঘরে দে যাবে।

রসিকের দলটা এখন মোটামুটি দাঁড়িয়েছে। ছিদাম ছড়িদার হয়েছে, মুখে মুখে ছড়া কাটতে পারে সে, তবু পাল্লা দেবার মত প্রস্তুতি এখনও হয়নি। যদিও হিলোড়ার মানুষরা সুখী গাইনের দলের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য খুব ধ'রে পড়েছিল। কিন্তু রসিক ওদের না করেছে, বুঝিয়েছে তার দল এখনো পাল্লা দেবার মত তৈরি হয় নি।

যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যায় আর বৈঠক বসেনি। রসিকই বারণ করেছিল, বলেছিল, আজ আর কুনো গান লয়, আজ লিজে লিজে কালকের আসরের কথা ভাব গে, উতে অনেক কাজ হবে।

তাই আজকের উঠোন ফাঁকা। রসিক একলা দাওয়ায় ছালা পেতে শুয়ে ছিল। আকাশ খুব পরিষ্কার, তারারা মিট মিট করে জ্বলছে, চাঁদের আলোয় উঠোন দাওয়া ভরে গেছে।

রসিক শুয়ে শুয়ে আগামীকালের শ্যামসুন্দরের মেলার কথা ভাবছিল। ওখানকার সাফল্যের ওপর তার সুনাম নির্ভর করছে। ঐ মেলায় অনেক দূর দূর থেকে লোক আসে, অনেক লোকের ভিড় হয়। ভালো গাইতে পারলে নাম হতে দেরী হবে না।

বাতাসী যখন তার ঘরে জল রেখে ফিরে যাচ্ছিল তখন রসিক ওকে ডাকল। বাতাসী এলে রসিক একটু সরে ওকে বসতে বলল। বাতাসী কিন্তু বসল না, খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

রসিক একটু অবাক হয়ে বলল, তুর কি হইছে বুল তো, আর তেমুন আসিস না, কাজ সেরেই চলে যাস্, একটু ভালো-মন্দ খপরও লিস না, তুর লিশ্চয় কিছু হইছে।

বাতাসী একটু গম্ভীর সুরে বলল, কি হবে আর? তুমার পিছে পিছে ঘুর ঘুর করলিই আমার চলবে, আমার কি কুনো কাম নাই? তুমি এখুন গানের মাস্টর হইছ, দিন রাত তুমার কাছে কত লোকের আমদানি, আমরা এলেও তুমার লজর পড়ে না, তুমি দেখতি পাও না।

বাতাসীর অভিমানটা বুঝতে পেরে রসিক বলল, বাতাসী, তু তো আমার অবস্থাটা বুঝতে পারিস, তু যদি আমার পরে আগ করিস্ তাঅলে ইখানে থাকি কি লিয়ে? মানুষের মুন বুলে একটো কথা আছে, উই ছিদেমদের সাথি কি সব মুন খুল্যে বুলা যায়? তুর সাথি আমার সিই ছোটুবেলা থেকি ভাব, তু যতটি বুঝবি, অরা কিছুই বুঝতে পারবে না। তু আমার পরে আগ করিস না।

রসিকের কথায় বেদনা ঝরে পড়লেও বাতাসীর কোন রূপান্তর দেখা গেল না। ও তেমনি ধরা গলায় বলল, তা কিয়ের ল্যাগে ডাকলে, বুললে না?

বুলছি, তু কাল আমাদের সাথি মেলায় যাবি? ছিদামের বো, হারাধনের বো—উরা সবাই যেছে, তুর কুনো কষ্ট হবে না, যাবি তু?

বাতাসী সেই চাঁদের আলোতে রসিকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলল, উয়াদের সোয়ামী আছে, আমার কে আছে, কার সাথি যাব? তুমি বুল কেনে? ও আর দাঁড়ায়নি, দ্রুত রসিকের উঠোন পেরিয়ে ওদের ঘরে ফিরে গিয়েছিল।

রসিক জানে বাতাসী যখন একবার না বলেছে তখন ওকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। রসিকের মনটা খারাপ হয়ে গেল। ও বুঝতে পারে না, বাতাসী না যাওয়ার জন্য তার কেন মন খারাপ করছে? বাতাসীর যাওয়া না যাওয়ায় কি এসে যায়? তবু বাতাসী গেলে যেন ভাল হোত, ও খুশি হোত। অত লোকের মাঝে সে গান করবে, সকলে বাহবা দেবে অথচ সে সব বাতাসী দেখতে পাবে না ভেবে ওর কষ্ট হচ্ছিল, নিরুৎসাহ বোধ করছিল।

হিলোড়ার গানের আসর কিন্তু খুবই উৎরাল। খুব বাহবা পেয়েছে ওরা। খুশি হয়ে অনেকে টাকাও দিয়েছে বাবুরা। প্রথম আসরেই ওরা সুনাম নিয়েই গাঁয়ে ফিরল।

ফেরার পথে মেলা ঘুরে রসিক বাতাসীর জন্য নাইলনের চুড়ি আর এক শিশি বাস তেল কিনল আর ওর মার জন্য কিনল একটা নকশাপাড় শাড়ি। ওদের কিছুই দেওয়া হয় না অথচ ওরা তার জন্য কত কি করে। খাওয়ার ধানটা জমি থেকে এলেও, এই যে সন্ধ্যে দেওয়া, ঘর নিকানো, তার হাতের কাছে এটা ওটা গুছিয়ে দেওয়া—এর কি কোম দাম নেই? মেলা থেকে ফিরতে ফিরতে রসিক ঐ সব কথা ভাবছিল।

রসিকরা ফিরে আসতে গাঁয়ে যেন উৎসবের সাড়া পড়ে গেল। তাদের দল ভিন্‌গাঁয়ে নাম করে এসেছে, এটা যেন তাদের কাছে দিগ্বিজয়ের আনন্দ। পথে লোক দাঁড়িয়ে গেছে। বাড়ির দরজায়, ভিটেয় দাঁড়িয়ে মেয়ে বউরা হাসি হাসি

মুখে ওদের দেখছে। বুড়োরা বিড়িটা হুঁকোটা নিয়ে মাথা নেড়ে ওদের তারিফ করছে। বহুদিন রাজবংশীপাড়ায় এমন বলার মতো কোন কাজ হয় নি তাই ওদের উন্মাদনাটা স্পষ্ট।

রসিক কিন্তু ঐ ভিড়েব মধ্যে ঢুকল না। এটা ওটা বলে ও দল ছেড়ে ঘবের পথ ধবল। ওব মনটা তখন বাতাসী, বাতাসীর মার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ও জীবনে কাউকে নিজে হাতে কিছু দেয় নি। ওর মা তো কোন্ কালে মারা গেছে, বাপ মরল বে-ঘরে। বাপমার সুখ আহ্লাদ ও মেটাতে পাবে নি কিংবা নিজের মন মতো তাদেব হাতে কিছু তুলে দেয নি। আজ মেলাতে নাইলন চুড়ি, বাস তেল, নকশা-পাড শাড়ি কেনার সময় থেকেই ও ভেতবে ভেতবে খুব উত্তেজনা অনুভব করছিল। ও আর সকলের মতো ঘবেব জন্য কিছু কিনে নিয়ে যাচ্ছে, এটা ভেবে ভেবে সে অস্থির হযে পডছিল।

বসিককে উঠোনে ঢুকতে দেখে বাতাসীব মা নেমে এলো। রসিকের কেন যেন আজ হঠাৎ প্রণাম করতে সাধ হল। ও কোনদিন কাউকে প্রণাম করেছে কি না ওব মনে পড়ে না। বাতাসীর মাব পাযের কাছে শাড়িটা নামিযে রেখে সে প্রণাম করল।

শাড়ি দেখে বাতাসীর মা খুব খুশি। বসিকেব থুতনিতে হাত দিযে চুমু খেয়ে অনেক আশীর্বাদ করল। রসিকের বাপের কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলল, শেষে একটু সামলে বাতাসীব কথা পাড়ল, দেখ না, উ কেমুনধারা ম্যাইযে, সিই কুন দুফরবেলায় উর গঙ্গাজলের বাড়ি গেছে আর ফেরার লাম নাই। আচ্ছা বাপ তুই বুল, আজকে কি কুথাও য়েতি হয়? তুর গানের আজ বউনি হল, ভিন্‌গাঁ থেকি কত খাতির লিযে এলি আর উ কি না সইয়ের বাড়ি জমে গেল। উই ম্যাইযেকে লিয়ে আমার হইছে জ্বালা। এখুন ডাগরটি হল, বিহ্যা তো কবে হই যাবার কথা। তুর বাপ নেহাত ধরি পড়ল, উর মরার সুময় কথা দিলেম, তাই উয়ার এখুনও বিহ্যা দিই নাই। গাঁয়ে ই লিয়ে কত কথা। আমি বুলি এদ্দিন যখুন সবুর করলি আর তো ক'টা দিন, অসিক বাপ একটু সামলে লিক, তাপরেই বিহ্যা হই যাবে। তা বাপ, ইবার তো তুর বউনি হল, দলের লাম হল, ইবার বিহ্যাডার ব্যবস্থা কর। তুর বাপের আঁত্তার কথাটা তো ভাবতি হবে, উ তো উই আশ লিয়েই মরলে।

সিদিন কত কাঁদন মানুষটার, শ্বাস উঠতি শুরু করছে, উয়ার মধ্যি আমার হাত ধরে বুললে, ছোটুবউ, আমার তো কিছু লাই, রসেটা কুথায় চলি গেল।

আমার ই তেপুরুষের ভিটে খাঁ খাঁ করবে, কেউ সন্ধ্যি দিতি থাকবে না। তু একটো কথা দে, রসে যদি ই দু'বছরের মধ্যি ফিব্র্যা আসে, তু উয়ার সাথি বাতাসীর বিহ্যা দিবি? ই ক'টাদিন বাতাসী ভিটেয় সন্ধ্যি দিবে, উঠান লিকাবে।

রসেটা ঘরছাড়া হল, বাতাসীকে লিয়েই তো ভিটে আঁকড়্যা পড়ে ছিলুম। মুনে বড় সাধ ছিল, উকে বউ করি আনব, রসেটা সংসারী হবে। লিজে তো পারলুম না। তু কথা দে, রসের ল্যাগে ই দু'বছর তু অপিক্ষে করবি। উ আসে তো ভালো, না এলে একটু দেখেশুনে বাতাসীর বিহ্যা দিস্। উকে আমার তিন বিঘে জমি লিখ্যা দিনু।

তা বাপ কি বুলব, শ্বাস উঠেছেল, মানুষটো মরতে লেগেছে, উকে কথা না দিই পারা যায়? আর বাতাসীটা তো উই ভিটেকেই উয়ার শ্বশুরভিটে ঠাউরেছে। রোজ রোজ সন্ধ্যি দেয়, উঠান লিকায় আর আমার ঘর উঠান লিকাবার কথা উর মুনে থাকে না, এই বুড়ো বইসে আমাকেই উ সব করতি হয়। তাই বুলি, এদ্দিন হল, ইবার বিহ্যা না হলি কথা উঠবে, মানুষে আমাকে দুষবে তা ইবার বিহ্যাডা করি লাও। বাতাসীর বয়সটি তো কম হলনি, উয়ারও তো একটা ছ্যালে, সোয়ামীর সাধ আছে, লিজের ঘর করার মুনে থাকৃতি আছে। তুদের বিহ্যাটা হলি আমারও সোয়াস্তি।

বাতাসীর মার কথা শুনতে শুনতে রসিক অবাক হয়ে গিয়েছিল। কেউ তো এ সব কথা তাকে জানায় নি। ছিদামদের কোন কোন সময়ের ঠাট্টাগুলো এখন ওর অর্থবহ বলে মনে হয়। আসলে সকলেই জানত, আর রসিক ফিরে আসায় বাতাসীর ঘটনাটা খুব স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে। রসিক দু'দিন গুছিয়ে বসলেই ওদের বিয়ে হবে। তাই রসিক-বাতাসীর ঘটনাতে ওরা বেশ রসের খোরাক পেয়েছিল।

রসিকও এ দিকটা অত ভেবে দেখে নি। এতটা বয়স পর্যন্ত বাতাসীর বিয়ে হয় নি, দিন দুপুর, সাঁঝ-সন্ধ্যায় তার কাছে বাতাসীর আসা যাওয়া—এ সব নিয়ে তার মনে কোন প্রশ্ন জাগে নি। বাতাসীকে তার শৈশবকালের সাথীর মতো ঘনিষ্ঠ, তার ব্যবহার সেই সময়ের মতো স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু বাতাসীরও যে বয়স হয়েছে, তার বয়সী আর সব মেয়েদের যে বিয়ে হয়ে গেছে, শৈশবকালের মতো সাঁঝ-সন্ধ্যায় তার সাথে বসে গল্প করা যে এখন দৃষ্টিকটু, এ সব কথা রসিকের মনে হয় নি। তাই বাতাসীর মায়ের কথায় সে

অবাক হল, তার খেয়াল হল, বাতাসী আজ আর কিশোরী নেই। তার চপলতার মধ্যে যুবতীর নিবিড়তা ফুটে উঠেছে।

বাতাসীকে নিয়ে তার বাপের আশা আকাঙ্ক্ষায় অস্বস্তি অনুভব করলেও সে বাপের খুব একটা দোষ দেখতে পায় না। বাপের সেবা, সময়ে অসময়ে দেখাশুনা করা সবই তো সে-ই করেছে। বাতাসীর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নারাণের চোখে মনে বাতাসীর চেহারাটা পাল্টাতে শুরু করেছিল। বাতাসীর কৈশোরকালীন চঞ্চলতা আস্তে আস্তে থিতিয়ে এলো, তার মধ্যে জন্ম নিল আর এক বাতাসী, যে নারাণের অসহায়তা, তার পুত্রশোকের জ্বালা, তার নিজের সংসারের কল্পনাটা অনুভব করতে পারে ; যে তার সেবা, শ্রদ্ধা, সমবেদনা দিয়ে নারাণের ক্ষত জুড়াতে পারে ; যার আব্দার, দাবীদাওয়ার মধ্যে নারাণের বুভুক্ষু পিতৃসত্তা সান্ত্বনা পায়।

রসিক তার অসহায় বাপের প্রতি বাতাসীর সেবা আন্তরিকতার জন্যে এক ধরণের কৃতজ্ঞতার জ্বালা অনুভব করে। বাতাসী না থাকলে তার বাপ শেষ মুহূর্তে হয়তো এক ফোঁটা জলও পেত না। মৃত্যুর পর তার তিন পুরুষের ভিটেয় সন্ধ্যে পড়বে, এ আশ্বাস না নিয়ে ঐ অসহায় মানুষটা মরতে পারত না। তাই বাতাসীর প্রতি একটা টান, একটা মমত্ব বোধ জাগছিল রসিকের, কিন্তু বাপের শেষ বাসনার জন্যে একটা অস্বস্তিও অনুভব করছিল।

রসিক জানে, নয়নের চেহারাটা মন থেকে মুছে যাবার নয়। তার জীবনের, তার যৌবনের একটা পরম সত্যের দ্বার নয়নের ঘনিষ্ঠতায় খুলে গেছে। নয়নের সান্নিধ্যে সে প্রথম অনুভব করেছে, তার জীবনেও নারীর জন্যে একটা অভাব বোধ আছে। সেও আর দশটা পুরুষের মতো বউ ছেলে নিয়ে ঘর করতে চায়। তার বুকেও একটা আদুরে আহ্লাদী বউয়ের ক্ষুধা আছে।

মতিঠাকরুণের বুভুক্ষু নারীত্বের কাছে সে অসহায় ছিল, বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার নীতিবোধ, পাপবোধ। তাছাড়া যে উন্মাদনায় সে গানের পাঠ নিচ্ছিল তার কাছে নারীর যৌবন, তার নিজের বয়সের তাগিদ প্রশ্রয় পায় নি। একদিকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অপর দিকে নীতিবোধ তাকে মতিঠাকরুণের দিকে এগোতে দেয় নি। মতিঠাকরুণের অসহায় মাতৃত্বের, নারীত্বের ডাকে তাই সে সাড়া দিতে পারে নি।

কিন্তু নয়নকে দেখবার পর তার শরীরের, তার মনের নিভৃত অঞ্চলের লুকানো দ্বারটি খুলে গেল। নয়নের লাঞ্ছিত, পর্যুদস্ত নারীত্বের জন্যে সহানুভূতি,

সমবেদনা অনুভব করল, নয়নের নিষ্ঠা আর আন্তরিকতা তাকে তার গোপন বাসনার মুখোমুখি দাঁড় করাল। তাই রসিক নির্দ্বিধায় প্রাণ খুলে সেদিন তাকে বলতে পেরেছিল, লয়ন, তু আমার সাথি যাবি? তুর সোয়ামী হবে, ছ্যালে হবে, তুর একটো সংসার হবে। তু আহ্লাদী বউয়ের মতুন ভাতার লিয়ে ঘর করতি পারবি।

রসিকের এই আহ্বানের মধ্যে কোন ফাঁকি ছিল না। তাই যখন বাতাসীর মার মুখে তার বাপের শেষ বাসনার কথা শুনল, বাতাসীর সেবা, ভক্তির কথা শুনল তখন সে খুব অস্বস্তি অনুভব করল। নয়নের প্রতি তার ভালোবাসা যেমন মিথ্যে নয় তেমনি বাতাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধটাও মিথ্যে নয়। বরং এই ক'দিনের মেলামেশায় ঘনিষ্ঠতায় বাতাসীর প্রতি তার গভীর একটা আবেগ, একটা দুর্বলতা জন্মেছিল। তাছাড়া তার বাপের শেষ ইচ্ছের কথাটাও তাকে ক্রমশই অসহায় করে তুলছিল। তাই রসিক কিছু না বলে বাতাসীর মার কাছ থেকে উঠে এলো।

রসিক ভরসন্ধ্যায় শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছিল। অহরহ তার মনে নয়ন আর বাতাসীর আনাগোনা চলছিল। উভয়েরই একটা নিজস্ব মাধুরী আছে, তার বুকের মধ্যে উভয়ের জন্যেই একটা নির্দিষ্ট জায়গা আছে, রসিক আজ কাউকে তাই বাদ দিয়ে ভাবতে পারছিল না। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের টানা পোড়েনে সে ক্রমেই দুর্বল আর অসহায় হয়ে পড়ছিল। সে কারুর পক্ষে অথবা বিপক্ষে আর যুক্তি সাজাতে পারছিল না, তাই দাওয়ায় শুয়ে শুয়ে সে নিজের বুকের মধ্যে দুই বিভিন্ন অনুভূতির অনুরণন শুনছিল।

এই ভরসন্ধ্যায় রসিককে শুয়ে থাকতে দেখে বাতাসী অবাক হল।

গঙ্গাজলের বাড়ি থেকে ফেরার পথে ছিদামদের উঠানে ওদের উল্লাস, হৈ চৈ শুনতে পেয়েছিল বাতাসী, সে অনুমান করেছিল, এই আনন্দ উৎসবের যে নায়ক সেই রসিকও নিশ্চয় ওদের মধ্যে জমে আছে। কিন্তু বাড়িতে এসে মার মুখে

রসিকের শাড়ি দেওয়ার কথা, তাকে না পেয়ে ফিরে যাওয়ার কথায় অবাক হল, ব্যস্ত হয়ে তাই রসিকের উঠানে এসে দেখে, এই ভরসন্ধ্যায় রসিক দাওয়ার ওপর চুপচাপ শুয়ে আছে।

বাতাসী ধীর পায়ে রসিকের কাছে এগিয়ে এসে ডাক দিল, রসোদা, আমার পরে আগ করেছ?

রসিকের সাড়া না পেয়ে বাতাসী আরো একটু কাছে গিয়ে দাঁড়াল, রসিক চোখ বুজে পড়ে রয়েছে। রসিকের কপালে একটা হাত রেখে বলল, রসোদা, তুমার শরীল খারাপ লয় তো?

মনের অমন বিশৃঙ্খল অবস্থায় বাতাসীর শীতল হাতের স্পর্শ পেয়ে রসিক অনেক শান্তি পেল। অদ্ভুত তৃপ্তিতে বাতাসীর হাতটা নিজের চোখে-মুখে বুলিয়ে নিয়ে বলল, বাতাসী, তু আমায় খুব ভালোবাসিস, না রে?

রসিকের কথা শুনে বাতাসীর শরীরটা থর থর করে কেঁপে উঠল। সেই তরঙ্গ বইল রসিকের মুখে চোখেও। রসিক বাতাসীর হাতটা নিজের বুকের কাছে নামিয়ে এনে বলল, বাতাসী, আমি বড় দুখী রে। ত্যাখ, মার কথা তো আমার মুনেই পড়ে না, কুন্ কালে মারা গেছে। বাপটো ছেল, তা আমার পরে আগ করে দুখ লিয়ে মারা গেল। তখুন তু যদি না থাকৃতি উকে খুব কষ্ট লিয়ে মরতে হোত।

বাপের শ্যাষ সাধেব কথা, তুর সেবার কথা তো কিছুই জানতেম না। এখুনও কেন তুর বিহা হয় নাই, ই কথাও মুনে জাগে নাই, আজ তুর মার মুখে সব শুনে খিয়াল হল, আমাকে লিয়েও তুর কত কষ্ট!

বাতাসী, তু ছাড়া তো আমার কেহু নাই, তু আগুতে আমার সখটা আশটা বুঝতিস, আমার কষ্ট দেখলে যেমুন করে সুহাগ করতিস্, আমার মুখ দেখে যেমুন করে মুনের কথাটি বুঝে লিতিস্ তেমুন করে কেহু আমাকে বুঝল না, কেহু ভাবল না। তাই তুকে আজ আমার দুখের কথা, মুনের কথা বুলব, তু-ই বুলে দে, আমি কি করি।

বাতাসী খুঁটিতে মাথা রেখে রসিকের কথা শুনছিল। রসিকের আবেগ থর থর কণ্ঠস্বরে ওর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠছিল। ও রসিকের কথার কোন সাড়া না দিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সেই নিরালা সন্ধ্যায় বাতাসীর সান্নিধ্যে, পুরানো স্মৃতির প্রবাহে রসিক কেমন ব্যাকুল হয়ে পড়ল। ওর বুকের মধ্যে অনেক সুখদুখের কথার তোলপাড়

চলছিল। ও অধীর হয়ে পড়েছিল। বাতাসীর ঘনিষ্ঠতায় রসিক একে একে মতিঠাকরুণের কথা, নয়নের কথা সব বলে গেল।

বলল, মতিঠাকরুণের আহ্বানে কামনা বাসনা ছিল ঠিকই, কিন্তু তা একটা বুভুক্ষু মাতৃত্বের কামনা। তার অমন বয়স, অমন যৌবন—অথচ তার বয়স, যৌবন নিয়ে কাড়াকাড়ি করার মানুষ মিলল না। তার শৈশবে সে কি ভেবেছিল তার এত সাধের শরীরটা নিষ্ফলা থেকে যাবে? একটা বুড়ো হাবড়া পঙ্গু শরীর নিয়ে কেঁদে ককিয়ে তার সারা জীবন কাটবে? একটা ছেলের জন্যে তার বুকটা টাটিয়ে উঠত, তার দেহে জ্বালা ধরত তাই সে বারবার ছুটে আসত রসিকের কাছে। রসিক একে পাপ বলে ভাবতে পারে নি বরং মতিঠাকরুণের জন্য তার কষ্ট হোত কিন্তু নীতিবোধের বেড়া ডিঙ্গাতে সাহস হয় নি তার, গুরুর সঙ্গে বেইমানি করতে তার মন চায় নি।

কিন্তু নয়ন—ও তো আর দশটা মেয়ের মতোই হেসে খেলে সুখ সোহাগ নিয়ে বড় হয়েছিল। আর সবাইয়ের মতো স্বামী ছেলে নিয়ে ঘর করতে পারত —কিন্তু ওর সমাজ, ওর বাবা মার স্বার্থ ওকে সুস্থ ভাবে বাঁচতে দিল. না। সুস্থ ভাবে বাঁচার স্পৃহা জাগার আগেই ওকে সেই চিরাচরিত অন্ধকার পথে টেনে নামানো হল। তাকে জাতব্যবসার কাছে দাসখৎ লিখে দিতে হল।

অথচ ওর মধ্যেও যে একটা সেবাপরায়ণা নিষ্ঠাবতী মেয়ে, আহ্লাদী বউ লুকিয়ে আছে তা তো রসিক নিজেই দেখে এসেছে। তার শরীরটা অপবিত্র ঠিকই, কিন্তু রসিক তো শরীর খুঁজতে যায় নি, তাহলে মতিঠাকরুণের অমন আনচান জবরদস্ত শরীর কি দোষ করল?

শরীর নিয়ে রসিকের অত মাথাব্যথা নেই। নয়তো দ্রৌপদীর চার স্বামীর তাতানো দেহ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সেবায় লাগত না। সাধন মাঝির দয়ায় রসিকের মনের অনেক আগল খুলে গেছে। রসিক খাঁটি জিনিস চিনে নিতে পারে, তাই নয়নের মনের ঠিকানা পেতে তার দেরী হয় নি। নয়নের মনে শরীরের ক্লেদ লাগে নি, তাই তার মধ্যে আত্মগ্লানি আছে, অনুতাপ আছে, কুণ্ঠা আছে। তাই নয়নকে আর সবাইয়ের থেকে পৃথক মনে হয়। ওর জন্যে মন কাঁদে।

বাতাসীর হাতটা মুঠোর মধ্যে ধরে রসিক বলল, আচ্ছা, তু-ই বুল, উয়ার কি দুষ? উ ভালোবাসতি জানে, সুহাগ করতি জানে, আদর কাড়তি জানে। উ ঘর পেলে, বর পেলে, ছ্যালে লিয়ে সুখে সংসার করতি পারত। আর সবাইর মতুন সন্ধ্যি দিত, উঠান লিকাতো, লক্ষ্মীপটে সেঁদুর দিত। উয়ার

বুকের দুধ পিয়ে ছ্যালে মরদ হত, উয়ার বুকের সুহাগ লিয়ে সেবা লিয়ে সোয়ামী সুখী হোত। আচ্ছা তুই বল বাতাসী, অমুন ম্যাইয়েকে লিয়ে ঘর বাঁধা কি অল্যায়, পাপ?

পাপ আমাদের মুনে, উ তো জানায় পাপ করে, প্যাটের দায়ে পাপ করে, আর আমরা মুনে মুনে, লুক কুরে পাপ করি। উয়ার পাপের পাচিত্তির আছে, আমাদের পাপের কুনো হিসাব নাই। তাই উয়ার পাপের কথা আমার মুনে লাগে নাই। সিদিনকার শ্যাষ মাঘের শীতে, ছ্যালা ঢাকা মানুষটোর কথা মুনে পড়ে। তুকে কি বুলব, অমুন মানুষ আমি কখুনো দেখি নাই। তুইও তো ম্যাইয়ে, বুঝবি উয়ার বুকের যন্তন্না, উয়ার নিত্যিদিনের কান্না।

বাতাসী, তু বুলে দে, উয়াকে যি কথা দিইছি তাতে কি ভুল হইছে? যি আমাকে মরণ থেকি বাঁচাল, তাকে ডুবার হাত থেকি বাঁচাতে চাওয়া কি অল্যায়? বাতাসী তুর কষ্ট আমার বুকে বাজে, কিন্তু তু আমার কষ্টটা, লয়নের দুখুটা বুঝ, তাপর তু যা বুলবি আমি তাই করব। তুর রসিকদা বেইমানি করবে না।

রসিকের ভারী কণ্ঠস্বর, আবেগরুদ্ধ বক্তব্য শুনতে শুনতে বাতাসীর বুকটা হাহাকার করে ওঠে। নয়নের জন্যে তার বুকেও কান্না জমে উঠছিল। নয়নের সঙ্গে তার নিজের কোথায় যেন একটা মিল আছে। নয়ন জীবনের শুরু থেকে একাকী আর বাতাসীকে সৌভাগ্যের সূচনায় একাকীত্বের জ্বালা এসে ঘিরে ফেলল। নয়নের মতো তারও ভাবতে ইচ্ছে করছিল, তার দোষ কোথায়? রসিককে কি সে ভালোবাসত? তার যখন ভালোবাসা-বাসির মনটা পাখা মেলতে শুরু করেছে সেই তখন থেকেই রসিক ঘর ছাড়া। তবু সেই শৈশব, কৈশোরের রসিককে ও ভুলতে পারে নি।

রসিকের বাপের সেবা করার সময় রসিকের সংসারের ওপর ওর একটা অধিকার বোধ জন্মে গিয়েছিল। ও যখন তুলসীতলায় সন্ধ্যা দেয়, ঘর নিকোয় তখন ওর মনে আপন ঘরের মাদকতা থাকে। সেখানে তাই ভালোবাসা-বাসির প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ আট 'ন বছর পর রসিককে দেখে বাতাসীর মনটা ছটফটিয়ে উঠল, প্রথম দেখার মুহূর্ত থেকেই তাই তার মধ্যে ভালোবাসার ভিতটা পাকা হয়ে গেল। টুকরো টুকরো ঘটনা, হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়ে তার ভালোবাসার অস্তিত্বটা স্পষ্ট হল, রসিকের সোহাগের জন্যে ওর বুকের মধ্যে একটা সুখ মাথা কুটতে শুরু করেছিল।

কিন্তু দিনে দিনে একটা আশঙ্কাও স্পষ্ট হচ্ছিল। রসিকের স্বপ্ন, রসিকের কল্পনার কাছে তার নিছক সংসারী মনটা ক্রমেই ছোট হয়ে পড়ছিল। রসিকের অত গুণ, অত নাম, অমন গলা—রসিকের পাশে তাই নিজেকে বড় হেয়, বড় দীন, বড নগণ্য বলে মনে হয়। রসিকের সামনে দাবী নিয়ে দাঁড়াবার মতো কোন যোগ্যতাই তো তার নেই।

তাই দিনে দিনে সে একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়ছিল, নিজেকে রসিকের কাছে অনুকম্পার পাত্র বলে মনে হোত। তাই তো সেদিন তার ক্ষোভ সে আর মনে চেপে রাখতে পারে নি। মেলার আগের দিন সন্ধ্যায় রসিকের কথার উত্তরে বলেছিল, ছিদামের বউরা যাবে না কেনে, উয়াদের সোয়ামী আছে, কিন্তু তুমি কিসের ল্যাগে আমাকে যেতি বুলছ?

সেদিন রসিককে অমন ভাবে বলার পর বাতাসী ঘরে গিয়ে ভীষণ কেঁদেছিল। নিজেকে তার ভীষণ একাকী অসহায় বলে মনে হয়েছিল। তারপর থেকে ও ভেতরে ভেতরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে, কতকটা ভবিতব্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে শান্তি পেতে চেয়েছিল। আজ তাই রসিকের কথা, মতিঠাকরুণের কথা, শুনে ও খুব একটা ভেঙে পড়ল না, বরং মতিঠাকরুণের প্রতি একটা মমত্ববোধ, একটা সহানুভূতি অনুভব করল। নয়নের দুর্ভাগ্যপীড়িত জীবনের জন্যে বেদনা বোধ করল। একটা অসহায় মেয়ের জন্যে তার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। ও তাই অনায়াসেই নয়নের বিড়ম্বিত জীবনের মধ্যে নিজেকে এক হয়ে যেতে দেখল। নয়নের লাঞ্ছিত জীবনের হাহাকারের প্রতিধ্বনি তার অবহেলিত অন্তরাত্মায় স্পষ্ট শুনতে পেল।

রসিক দাওয়ায় চুপচাপ শুয়ে আছে। বাতাসী খুঁটিতে মাথা রেখে তার নিজের কথা, নয়নের কথা, মতিঠাকরুণের কথা ভাবতে ভাবতে নিজের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। শেষে তার বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস নেমে গেল। রসিকের হাতের মধ্যে তার হাতটা কেঁপে উঠল।

বাতাসী গভীর স্বরে বলল, রসোদা, নয়নের কাছেই তুমার যাওয়া উচিত। নয়নকে সুখী করা তুমার কত্তব্য। তুমি ঠিকই বুলেছ, শরীলটা কিছু লয়, মুনটিই সব, উতে ফাঁকি না থাকলিই হল।

রসিক আবেগের সঙ্গে বাতাসীর হাতটা মুঠোয় চেপে ধরল, রসিক যেন একটা আশ্রয় পেয়ে বেঁচে গেল। বাতাসীর কথায় তার অপরাধটা কেটে গেল, বুকটা অনেক হাল্‌কা হল।

এরপর বাতাসীরও যেন কথা ফুরিয়ে যায়। সেই আবছা অন্ধকারে দুটি মানুষ আপন আপন ভাগ্যের কাছে নিজেকে সঁপে দিল। তাদের দুজনের হৃদয়েই তখন নিঃশব্দে কান্না ঝরছিল।

অনেকক্ষণ পরে একটা ডাক শুনে রসিকের চমক ভাঙল। বাতাসীর মা খেতে ডাকছে। রসিক পাশে তাকিয়ে দেখল, বাতাসী নেই, কখন সে উঠে গেছে, ও জানতেও পারে নি।

রসিক উঠে ঘরে লণ্ঠনটা জেলে জামা ছাড়তে যেতেই পকেটের চুড়িগুলো বেজে উঠল। রসিক পকেট থেকে চুড়ি ক'গাছা আর বাসতেলের শিশিটা বার করল। তার মনটা কেমন করে উঠল, কেনার সময় কত কি সে ভেবেছিল—বাতাসীর খুশি খুশি মুখটা বার বার তখন মনে পড়েছিল, কিন্তু কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। এখন আর এ সব দেওয়ার কোন মানেই হয় না।

রসিক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুড়ি ক'গাছা আর বাসতেলটা ঘরের কুলুঙ্গিতে তুলে রেখে খেতে গেল।

দেখতে দেখতে বর্ষা এসে পড়ল। বিলটা জলে ভরে উঠেছে। গাঁয়ের মানুষের মনে এক উন্মাদনা দেখা দিয়েছে। বিলটায় সালতে, পানসি, ডোঙ্গা ভেসে বেড়াচ্ছে। ঘরের কাজ সেরে সকলেই বিলের ধারে ছোটে। সারা গাঁয়ে আনন্দ উৎসবের সাড়া পড়ে যায়।

রসিক আজকাল ঘর থেকে খুব কমই বেরোয়। ঘরে বসেই গান বাঁধে, ছড়া বাঁধে। ছিদাম, পরান, নন্দ ওরাও নিয়মিত বৈঠকে আসে। নতুন নতুন পালা নিয়ে জোর তালিম চলে।

শ্রাবণ প্রায় শেষ হতে চলল। ভাদ্র পড়লেই পুজোর তাড়া পড়বে। এর মধ্যেই দু-একটা গাঁ থেকে লোক এসেছে, গানের পালা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। রসিকের ও সব ভালো লাগে না। ছিদামই বায়না নিয়ে কথা বলে, কোথায় কোথায় বায়না নেওয়া হবে সে-ই সব ভাবছে।

এখন রসিকের একমাত্র কাজ দলকে সব দিক দিয়ে উপযুক্ত করে তোলা, তাই দু'বেলাই আজকাল বৈঠক বসে। মাঝে মাঝে সে নতুন ছড়া কেটে ছড়িদার ছিদামের বুদ্ধির পরীক্ষা করে, কখনও তালফেরতা গান ধরে নন্দ তবলচির উপস্থিত বুদ্ধি পরখ করে, আবার কখনও নিজেই ছোকরা সেজে চিন্তু, হারাকে নানান্ ঢঙ দেখিয়ে দেয়।

এর মধ্যে বাতাসী আসে, আগের মতোই ঘর গুছিয়ে উঠান নিকিয়ে দেয়, সন্ধ্যে দেয়। তার মধ্যে যে কোন পরিবর্তন এসেছে বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তবে খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ওর মধ্যে সেই আগের মতো প্রাণচাঞ্চল্য আর নেই, ও যেন নিজের মধ্যে অনেকটা গুটিয়ে গেছে। 'ক্ষণে ক্ষণেই ও আর খুশিতে ফেটে পড়ে না, ওর ফুর্তির উৎসটা যেন শুকিয়ে গেছে।

মাঝে ওর মা একবার বিয়ের কথা পেড়েছিল। বাতাসী তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, এখন সে বিয়ে করবে না।

বাতাসীর মা অবাক হয়, ইটা কেমুনধারা কথা! বিহ্যা করবি না তো সারা জীবন কি আমি তুরে আগলে থাকব? তুর বয়সটার কথা একবার ভাব দিকি, তুর বয়সে অমুন দু-তিন ছ্যালের মা হুইং যায়। লতি ইবারও তো গব্ব হই ঘরে এইচে আর তুর এখুনও মতিস্থির হল না।

মার অমন কথার জন্যেই বাতাসী ঘরে থাকে কম। বিলের ধারে অন্য পড়শিদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। সেখানেও যে রেহাই আছে তা নয়। মেয়েদের কৌতূহল বেশী, তাছাড়া বাতাসীর মতন বয়সের কুনো মেয়েই বাপের বাড়ি থাকে না। তাই ওদের আলোচনায় দু-চারটে কথার পরই বাতাসীর কথা ওঠে। বাতাসী প্রথম প্রথম উল্টো পাল্টা জবাব দিত, এখন শুধু হাসে, তাতে কৌতূহল না মিটলেও, ওরা বিষয়টায় রস পায়।

এই ভাবে দিন কাটতে কাটতে মহালয়া এসে গেল। রসিকদের খুব তোড়-জোড় চলছে। দুর্গাপূজার চারদিনই বায়না পাওয়া গেছে। ছিদাম খুব ঝানু অধিকারীর মতো বায়নানামা করেছে, আগাম নিয়েছে। থাকা খাওয়া বিড়ি তামাকের কথা পাকা করে ফেলেছে।

ষষ্ঠীর দিন দুপুরের দিকে রসিকরা তিনটে গোগাড়ি করে যাত্রা করল।

প্রথমে আহিরণে, সেখান থেকে মোড়গ্রাম, সব শেষে ছাপঘাঁটি।

যাওয়ার আগে রসিকের খুব ইচ্ছে ছিল বাতাসীর সঙ্গে দেখা করে।

বাতাসীর মাকে প্রণাম করে একবার খোঁজও করেছিল, কিন্তু ধারে কাছে কোথাও বাতাসীকে দেখতে পায় নি।

পথে যেতে যেতে রসিক আর সবাইকে ভুলল। ওর চোখের সামনে শুধু আগামী আসরগুলোর দৃশ্য ভাসতে লাগল।

হিলোড়ার গানকে ও নিজে ঠিক বউনি বলে ভাবতে পারে নি। সে আসরে গান গাওয়ার তাগিদ তাদেরই বেশী ছিল, কিন্তু এখন ভিনগাঁয়ের লোকেরা ওদের বায়না দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাই এটাই রসিকের জীবনের বউনি। তাই আসরের সাফল্য সম্পর্কে তার দুর্ভাবনা জাগছিল। তবে ছিদাম নন্দর নিষ্ঠা, ধুয়োদারদের আন্তরিকতা, সর্বোপরি নিজের আত্মবিশ্বাসের জন্যে রসিক জানত, খুব খারাপ একটা কিছু হবে না। কিন্তু সে ভালো কিছু করতে চায়। সে অনেক উঁচুতে উঠতে চায়। লম্বোদর, গোমানির মতো, ঝাঁকসু মাঝির মতো সবাই যেন এক ডাকে তাকে চিনতে পারে।

পুজোর ক'টা দিনের গানে রসিকের আশা অনেকখানিই পূরণ হল। নামের সঙ্গে সঙ্গে পয়সাও জুটেছে। ছাপঘাঁটিতে দু'রাত গান—নবমী, দশমী। নবমীর গানে তো রীতিমত বাহবা জুটেছে। জমিদার পর্যন্ত গানের তারিফ করেছেন। এখন আর একদিন কাটলে হয়। দশমীর পালা শেষ হলেই সবাই গাঁয়ে ফিরবে।

গাঁয়ে ফেরার জন্যে সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের কৃতিত্বের কথা যতক্ষণ না সকলকে শোনাতে পারছে ততক্ষণ সুখ নেই।

ভাসানের দিন বিকেল বেলায় ছিদাম এসে বলল, মাস্টর শুনেছ, পূবপাড়ায় ঝুমুর বসছে। কত্তাবাবু বুললেন, ইবার দেখব তুদের কেরামতি, যদি উ পাড়া থেকি মানুষ হটায়ে আনতি পারিস তাঅলে তুদের সকলকে একপ্রস্থ কাপুড় গামছা দিব। মাস্টর, একবার লড়ে যাও তো দেকি—উ শালারা দেখুক, ই শালা হেষ্টাপেষ্টা দল লয়, রাজবংশীদের দল। লাঠিবাজিও করতি পারে, আবার গানবাজি ও করতি জানে।

রসিক কিন্তু তখন অন্য কথা ভাবছিল। ছিদামের মুখে ঝুমুরের কথা শুনে ওর বুকটা ছ্যাঁত করে উঠেছিল। হয়তো এটা নয়নদের দল নয় তবু মনের মধ্যে একটা যন্ত্রনা, একটা সন্দেহ জাগছিল। অন্য সময় হলে রসিক হয়তো তখনই ছুটত কিন্তু এখন গেলে ওর কর্তব্যের ত্রুটি হবে, দলের বদনাম হতে পারে, নিজের স্বপ্নটা আঁধারে মিলিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া ও ভেতরে ভেতরে একটু শঙ্কিতও হয়ে পড়েছিল, যদি নয়নদের দলই হয় তাহলে তা জানার পর হয়তো ও আর গান চালাতে পারবে না।

ছিদামের কাছ থেকে খবরটা শোনার পর থেকে রসিকের মনে নানান্ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। এতদিন দলগড়ার দিকে সে এমন মেতে ছিল যে, নয়নের কথা আর তেমন করে তাকে টানে নি। দিনরাত শুধু একটিই চিন্তা—দল গড়তে হবে, ছিদাম পরান ওদের তালিম দিয়ে দিয়ে গড়ে-পিটে নিতে হবে। চলনসই দল গড়ার দিকে ওর নজর ছিল না, ও যে লম্বোদের গোমানির মতো ডাকসাইটে মাস্টর হতে চায়, তার নাম শুনলে দশ গাঁয়ের মানুষ মাথা নাড়বে, হ মাস্টর বটে!

হয়তো কখনো সখনো কাজের ফাঁকে নয়নের মুখটা ভেসে উঠেছে, কোন বাদলা রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে সেই চাঁচের বেড়া, ছ্যালা ঢাকা আদুরে মেয়েটির কথা মনে পড়েছে, কেমন আহ্লাদী বউয়ের মতো হাঁটু মুড়ে, বুকে মুখ ঢেকে তাকে জড়িয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। রসিকের বুকটা শির শির করে উঠেছে, ও কল্পনায় বউটির ঠোঁটে আঙুল বুলিয়েছে, চোখে চুম্ খেয়েছে, তারপর তাকে বুকের গভীরে টেনে নিয়ে তার কাঁপুনি থামিয়েছে। এবং এমন চিন্তার মধ্যেই এক সময় ঘুমিয়েও পড়েছে।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। সকাল হয়েছে আবার কাজের তাড়া, গানের আসরে মানুষটা এমদম পাল্টে যায়, কোন হুঁশ থাকে না।

আর বাকী সময় বাতাসীর আসা যাওয়া, বাতাসীকে নিয়ে রঙ্গ রস, বাতাসীর সঙ্গে ফক্কুড়িতে সময় কোথায় দিয়ে কেটে যায় বোঝা যায় না। তার মনের শ্রান্তি ক্লান্তিগুলো বাতাসীর সঙ্গ পেয়ে, বাতাসীর ঘনিষ্ঠতায় দূর হয়ে যায়, রসিক নতুন উদ্দমে গান নিয়ে মেতে ওঠে। তাই এই দীর্ঘ এক বছরে গান বাজনার ফাঁকে ফাঁকে রসিক বাতাসীকে নিয়ে যত ভেবেছে, নয়নের কথা, নয়নের চিন্তা তাকে তত ভাবায় নি।

সেদিন বিকেলে ছিদামের মুখে ঝুমর গানের কথায় ও একটা প্রচণ্ড নাড়া খেয়ে জেগে উঠল। একটা আকুলতা বুকের মধ্যে মাথা কুটছিল। ইস্, কদ্দিন নয়নের খবর পায় নি। নয়ন কেমন আছে কে জানে। ও পুবপাড়ায় যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিল কিন্তু আসর ছেড়ে যেতে পারছিল না, এই গানের সঙ্গে ওর দলের ভালো-মন্দ জড়িয়ে আছে। যদি সত্যিই সে তার আসরে মানুষ ধরে রাখতে পারে, পুবপাড়া থেকে তার গানের টানে মানুষ হটিয়ে আনতে পারে তাহলে তার দলের নাম বাড়বে, গানের কথা বলে লোকে বাহবা দেবে, হুঁ বাবা, ই কি যেমুন-তেমুন দল, গান শুনতি শুনতি মানুষে সব পাকুড় আঠার মতু জমে গেলছেল, ঝুমুরীদের গা গতর সিথানে এঁটো পাতের সামিল। হুঁ, ই বাবা, রসো মাস্টরের দল!

মনের মধ্যে উত্তেজনা থাকলেও এমন সুনাম করার সুযোগ রসিক হাতছাড়া করল না। তাছাড়া ছিদামরা এত বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে সকলেই তাদের ভালোটুকু তুলে ধরতে তৎপর হল। ফলে লোক ধরে রাখতে রসিককে খুব বেগ পেতে হল না। হারা, চিন্তু নাচতে নাচতে এমন চমক ধরিয়ে দিল যে আসরের মধ্যে মুহুর্মুহু হাসির ঝর্ণা, খুশির বন্যা বয়ে গেল।

রাত এগারোটায় গান ভাঙল। চতুর্দিকে বাহবা, নানান্ উল্লাস। স্বয়ং কর্তাবাবু নিজে এসে রসিকের বুকে একটা দশটাকার নোট গেঁথে দিলেন। কিন্তু এত আনন্দের সঙ্গে রসিক মন মেলাতে পারছিল না, ওর মনে তখন আশঙ্কার ঝড় উঠেছে। ও সবার অলক্ষ্যে আসর থেকে বেরিয়ে এলো।

দূর থেকেই ঝুমুর আসরের দিকে উল্লাস শোনা যাচ্ছিল। আলকাপ গানের জোয়ান শ্রোতারা সব চলেছে ঝুমুর আসরের দিকে। তাদের সাথে সাথে রসিক পুবপাড়ার আসরে এসে হাজির হল।

চারকোণে চারটে বাঁশে হ্যাজাক জ্বলছে। চারটে বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা বাহারী চাঁদোয়া। তার তলায় ঝুমুরের আসর বসেছে। চারদিকেই মানুষ, আরো মানুষ আসছে, গাদাগাদি করে দাঁড়াচ্ছে, সকলের চোখে ঝকঝক করে লালসা জ্বলছে। মাঝখানে ফাঁকা চত্বরে নানা বয়সের চারটে মেয়ে বুক কোমর দুলিয়ে নেচে চলেছে। চোখে চোখে বিদ্যুৎ খেলছে, ঠোঁটের ফাঁকে অশ্লীল হাসি ছুটছে, ঠোঁট কেটে, চোখ মট্‌কে তারা নাচছে। আর পায়ের গোছায় বাঁধা ঝুমুরে ঝুম ঝুম আওয়াজ উঠছে।

একটা মেয়ের বুকে ফিনফিনে নাইলনের ব্লাউজ আর পরনে হাঁটু পর্যন্ত ঘাঘরা। সহজেই তার দিকে নজর পড়ে, দৃষ্টি পড়ে তার খোলামেলা শরীরের ভাঁজগুলোর দিকে। নাচতে নাচতে মেয়েটির শরীরের প্রতিটি অংশ ছটফটিয়ে উঠছে। মেয়েটি কত অনায়াসে মানুষগুলোর হাতের নাগাল থেকে পিছলে বেরিয়ে আসছে। কত অবহেলায় মানুষগুলোর দাঁতের ফাঁকে আটকানো সিকি, আধুলি মুহূর্তে ঠোঁট দিয়ে তুলে নিচ্ছে, অথচ মানুষগুলো তাদের দু'হাত, মুখ, পা নিয়ে মেয়েটিকে ধরে রাখতে পারছে না, ফলে তারা আরো উত্তেজিত, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে।

মেয়েটি এক ফাঁকে, বাজনার তালে তালে খুব দ্রুত কোমর ঘুরিয়ে একবার পাক খেল, ঘাঘরাটা গোল হয়ে ফুলে উঠল, বুকের আঁচলটা পালের মতো উড়তে লাগল, আর তার তলপেটের কাছে নাইকুণ্ডলী ঘিরে লাল নকশা জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠল। রসিক চমকে কাছে এসে দেখে, মেয়েটি তার খুব পরিচিত, কিন্তু কোথায় দেখেছে কিছুতেই মনে করতে পারে না। যতগুলি মেয়ের সঙ্গে তার পরিচয় কারুর সঙ্গেই ওর মিল নেই অথচ ও অপরিচিত নয়।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে পড়ল, সেই বৈরেগীতলার মেলায় তার জ্বরের সময় যে মেয়েগুলো নয়নকে ডাকতে এসেছিল, এ মেয়েটি সেই দলের, এই মেয়েটিই তাকে ঠেশ দিয়ে কথা বলেছিল আর খিল খিল করে হেসেছিল। ঐ মেয়েটিরই নাম পাখি।

রসিকের মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো ভীষণ ভাবে চঞ্চল হয়ে পড়ল। রসিক মিষ্টির দোকান থেকে কর্তার দেওয়া নোটটা ভাঙিয়ে নিল। তারপর আসরে এসে দু'টাকার নোটটা ফেরীর মতো তুলে ধরে নাচাতে লাগল।

নোটের দিকে নজর পড়তেই মেয়েটি নাচতে নাচতে এগিয়ে এসে রসিকের কোমর জাপটে ধরল। রসিকের গা শির শির করে ওঠে, ও মেয়েটিকে শূন্যে তুলে নেয়।

মেয়েটির মুখ দিয়ে ভক ভক করে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। চোখদুটো জবাফুলের মতো লাল হয়ে উঠেছে। বড় বড় শ্বাস পড়ছে। মাঝে মাঝেই শরীরটা ছটফটিয়ে উঠছে। রসিক মেয়েটির ভারী শরীরটা আড়ালে তুলে নিয়ে গিয়ে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিয়ে খুব উত্তেজিত স্বরে বলল, এ্যই, তুদের সিই লয়ান কুথায় গেল? সিই লয়ন ঝুমুরী?

মেয়েটি তার ফিনফিনে ব্লাউজটা খুলতে খুলতে বলল, কেনে, আমারে বুঝি আর পসন্দ হল না?

রসিক ওকে একটু নাড়া দিয়ে বলল, না, উ লয়ন কুথায় বুল, ত্যালে তুকে পাঁচ ট্যাকা বকশিস দিব।

রসিকের কথা শুনে মেয়েটির ঘোর কাটতে লাগল। বলল, কেনে, উয়ার খপরে তুমার দরকার? উয়াকে দল থেকি বাতিল করি দেছে।

রসিকের ধৈর্য যেন আর বাঁধ মানে না—বাতিল করি দেছে! কেনে বুল না, কেনে উকে বাতিল করলে?

অতশত জানি নে বাপু, তুমার সাথী রং করার মতুন অত সময় নাই। এখুন সুখ মিটাও, টাকা দাও, আমারে আসরে যেতি হবে।

রসিক ওর হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে বলল, সুখের জন্যি তুকে ডাকি নাই, তু শুধু লয়নের হদিশটা দে, তাপর আসরে চলি যা, তুকে এজন্যি পাঁচ টাকা দিলাম।

মেয়েটি অবাক হয়ে রসিকের দিকে চেয়ে বলল, উয়াকে আর দলে নেওয়া হবে নি, উ বাতিল। তুমি সাঁইথিয়া টিশনে লেমে ভাবঘাঁটি গাঁয় খবর লিও, উখানে উর খপর মিলতি পারে।

রসিক আর কিছু না বলে দলে ফিরে গিয়েছিল। তারপর ছিদামকে আড়ালে ডেকে পঞ্চাশটা টাকা চেয়ে নিয়ে স্টেশনের দিকে হাঁটা দিয়েছিল, শুধু চিৎকার করে বলেছিল, তুরা গাঁয়ে ফিরে যাস্, আমি ক'দিন ঘুরে যাব। তার পরেই স্টেশনের দিকে ছুটেছিল—এই ট্রেনটা তার ধরা চাই।

সাঁইথিয়া স্টেশনে নেমে রসিক চায়ের দোকানে ভাবর্ঘাটির খোঁজ নিল, দু-তিন ক্রোশ হবে। সে মেঠো পথ ধরে হাঁটতে শুরু করল।

গাঁয়ে পৌঁছে একে জিজ্ঞেস করে, ওকে জিজ্ঞেস করে কিন্তু নয়নের খোঁজ পায় না। শেষে এক বুড়ি ওর প্রশ্ন শুনে থমকে দাঁড়াল, তারপর অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে একটা ছিটেবেড়ার ঘর দেখিয়ে দিল।

তখন বেলা পড়ে আসছে। পশ্চিম আকাশে সূর্য তখনও ডোবেনি। রোদের তেমন তেজ নেই বরং সেই লালাভ রোদ বড় মধুর বলে মনে হচ্ছে। পাশেই কেঁদুরি, ওপারে নয়নের সেই শৈশবের খেলাঘর—হিজল মেহেদির বন। সবেদা, ফলসা, হিজলের পাতায় লাল রোদের আলপনা। অপূর্ব মোহময় এই বনফুলের জঙ্গল। নয়নের কাহিনীর সঙ্গে সব হুবহু মিলে যাচ্ছে। তাকিয়ে তাকিয়ে রসিক কেমন বিভোর হয়ে পড়ে।

রসিক এমন পরিবেশে খানিকটা শান্তি পেল। ও সেই ছিটেবেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করে দরজাটা ঠেলল। পশ্চিমের লাল লাল রোদ হুমড়ি খেয়ে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। সেই রোদের আলোয় রসিক দেখল ঘরের মেঝেয় কাঁথার ওপর একটি মেয়ে পাশ ফিরে শুয়ে আছে। একটু কাছে গিয়ে মেয়েটির কানের লতির নিচ থেকে থুত্‌নি পর্যন্ত দেখতে পেয়ে ওর আর সন্দেহ রইল না। রসিক 'লয়ন লয়ন!' বলে বার দুই ডাক দিল।

মেয়েটির শরীরটা একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। চোখ খুলে রোদের দিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে না পেয়ে অস্পষ্ট স্বরে বলল, কে? কে?

সেই ভাঙা ভাঙা ক্লান্ত স্বর শুনে রসিক আর স্থির থাকতে পারল না, ও ছুটে নয়নের কাছে গেল। আর নয়নের মুখের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল—নয়নের মুখ, গলা, বুক কেমন লাল্‌চে ফুস্কুড়ি নিয়ে ফুলে উঠেছে। কোনটির মধ্যে আবার কাল্‌চে জল টল টল করছে। রসিকের বুক চিরে আর্তনাদ বেরোল, লয়ন, ই তুর কি হল? আমি যি তুকে লিতে এইছি—

নয়নের ঠোঁট দুটো থর থর করে কেঁপে উঠল, চোখ দুটো টান টান হয়ে স্থির হল, বিড়বিড় করে বিকৃত গলায় বলল, লাগর, তুমি কেনে এলে? তুমি চলি যাও, ই বড় খরাপ ব্যারাম, বড় ছুঁয়াচে, তুমি ইখানে বোসো না, চলি যাও।

রসিকের চোখ ফেটে কান্না বেরিয়ে এলো—লয়ন তুকে যি আমি লিতে এইছি। তু জানিস না, আমার দলের নাম হইছে, বায়না মিলছে। তুকে লিয়ে যাব বুলে ঘর সাবায়েছি, দ্যালে রঙ দিইছি, লয়ান, তুকে আমি লিয়ে যাব।

রসিকের কথা শুনতে শুনতে নয়নের চোখ দিয়ে হু হু করে জল গড়িয়ে নামল। একটা অদ্ভুত হাসিতে ওর সেই কুৎসিত মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, খুব ধীরে ধীরে বলল, লাগর, তুমি আমায় লিতে এলে আর আমারও যাবার সুময় হল। ভগবানের কাছে কুনো কিছুর ছাড়ান নাই। ই শরীলটায় তো কম পাপ লিই নাই তাই শরীলটা গলে গলে পড়ছে।

রসিক ক্রন্দনরতা নয়নের মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিয়ে এক হাতে নয়নের চোখ মুছাতে মুছাতে বলল, লয়ন, উ সব কথা তু বলিস না, আমি তুকে লিয়ে যাব, তুর চিকিৎসে করাব। তু ভালো হয়ে উঠবি, তুর ঘর হবে, ছ্যালে হবে, লয়ন তু অমন করিস না, আমি তুকে লিতে এইছি, তু অবুঝ হোস্ না।

নয়ন কাঁদতে কাঁদতে বলল, লাগর, তুমি তেমুনি পাগল আছ, বুঝতে পারছ না, আমার যাওয়ার সুময় হল। আজ কোবরেজ বুলে গ্যাছে, ই রেতটা টি:ক থাকলেই অনেক। লাগর, তুমি নাড়ি দেখতি জানো, দেখ তো আর ক'দণ্ড আছি? লাগর, তুমায় কি বুলব, কুনোদিন তো ভালো কাম করি নাই, ঠাকুরের নামও লিই নাই, ই ক'দিন শুধু কেঁদেছি, ঠাকুরকে ডেকেছি, মরার আগে তুমাকে দেখার বড় সাধ। আমি তো একদিন ঝুমুর দলের রাণী ছিলুম, আর আজ ছ্যাখ, কেউ ইখানে আসে না, ওষুধ-পথ্যির টাকা নাই, সাবু করি দিবার মানুষ নাই। মরলে উয়ারা দেহটা টেনে উই কেঁদুরের ধারে ফেলি দিবে, শ্যাল-কুকুরে ছিঁড়ে খাবে। বাঁচার ল্যাগে ঠাকুরকে কত্তো ডাকতাম—না, বাঁচার ল্যাগে না, ই ঝুমুরীদের কালরোগ. ইতে বাঁচে না, শুধু তুমায় ছ্যাখার ল্যাগে—আর কি আশ্চয্যি দেখ, তুমি এলে, তুমার কোলে মাথা দি আমি শুয়ে আছি। ই যি কত্তো সুখ লাগর বুলতি পারব না। আমার আর কুনো কষ্ট নাই। এমুন করে তুমার কোলে মাথা রাখ্যা যদি মরতি পারি, জানব অনেক পুণ্যি করছিলাম।

তারপর একটু দম নিয়ে এবার অনুরোধের সুরে বলল, লাগর, আমায় তুমি উদের মতো কেঁদুরের ধারে ফেলি দিও না। আমার বড় সাধ ছিল, উই হিজল মেহেদি বুনে যিখানে কামরাঙার তলে দুধলা ঘাস জমেছে উখানে মরতি, উই জাগায় গাছে গাছে, মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতেম। লাগর, এই লষ্টা লয়ানের শ্যাষ বাসনাটুকু রাখবে? উখানে আমারে পুড়াবে? বুল লাগর, আমার ই কথাটো রাখবে?

নয়নের চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে বড় বড় ফোঁটা জল পড়তে লাগল। রসিক বুঝতে পারল, নয়নের সময় হয়ে এসেছে। ওর কষ্ট আর সহ্য হচ্ছিল না, তাই রসিক গভীর গলায় বলল, লয়ান, তু একটু থির হ, তুর কুনো বাসনাই অপূরণ থাকবে না। তুর লাগর যি তুরে কোলে লিয়ে বসে আছে। শান্ত হ লয়ন, তু একটু শান্ত হ। তু যে আমার লয়ান বউ। তুর সব সাধ মিটবে।

নয়নের চোখে মুখে অপূর্ব প্রশান্তি নেমে এলো। রসিকের কোলে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ পড়ে রইল। শ্বাসের টানে ওর শরীরটা ফুলে ফুলে উঠছিল। পরে চোখ খুলে সোহাগী সোহাগী গলায় নয়ন বলল, লাগর, উই বালিশটা আমার ঠায় লিয়ে এসো না।

রসিক হাত বাড়িয়ে বালিশটা নয়নের নাগালের মধ্যে এনে দিল। নয়ন বালিশের সেলাইটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে ওর ভেতর থেকে একটা লাল বাক্স বের করে খুলল। তারপর খুব কুণ্ঠা নিয়ে বলল, লাগর, ই হারছড়াটো তুমার বউকে দিও, আমার তো আর কিছুই নাই।

রসিক অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে নয়নের মুখের দিকে। নয়ন বলে, না লাগর, ইটা পাপের পয়সায় লয়। সিবার তুমি চলি যাবার পর, আমি দল ছাড়ি আমার ই গাঁয়ে চলি আসি। ইখানে ঝুড়ি, কুলো বুনে দু-পাঁচ পয়সা করে জমায়ে ইটা কিনছি, তুমার বউয়ের কথা ভেব্যে তুলে রাখছি, লাগর, তুমি ইটা লিবে তো? বিশ্বেস কর, ইটো পাপের পয়সায় লয়, গতর খাটায়ে গড়ায়েছি। বুল লাগর, লিবে তো?

পশ্চিমের রোদ কখন শেষ আলো বিলিয়ে হারিয়ে গেছে। ঘরটায় ছোপ ছোপ অন্ধকার। রসিক নয়নের চোখে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, বউ, তু অমুন, করিস না, তু একটু থির হ, তুর কুনো বাসনাই অপূরণ থাকব না। তু এখুন একটু চুপ কর, শান্ত হ।

নয়ন একটু অধীর ভাবে ওর হাতটা চেপে ধরে বলল, না লাগর, তুমি ইটা লাও, লয়তো মরেও আমি শান্তি পাব না। লাগর, তুমি একদিন আমাকে বিহার সুখ দিয়েছিলে কিন্তু আমি তো জানি, ই হবার লয়, তাই তুমার বিহার জন্যি ইটা গড়ায়েছি। তুমার বউ পরলিই আমার পরা হবে। বুল লাগর, ইটা তুমি লিবে না?

নয়নের দুর্বল হাতটায় হারছড়াটা দুলছে, টুং টুং করে মিষ্টি আওয়াজ হচ্ছে, নয়ন অসীম আগ্রহ নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

রসিক হারছড়াটা নেওয়ার পর নয়নের ঠোঁটে হাসি ফুটল। বলল, লাগর আর তো কুনোদিন তুমাকে জ্বালাতি আসব না, আজ শ্যাষবেলায় তুমায় একটু জ্বালায়ে গেলাম। বলতে বলতে নয়ন হাঁপিয়ে উঠছিল, একটু দম নিয়ে বলল, লাগর এই বেলায় তুমার একটু পায়ের ধুলো দাও আর হয়তো সুময় পাব না।

নয়নের চোখের দিকে তাকিয়ে রসিক আর দ্বিধা করল না। নয়ন হাত দিয়ে তার দু'পা ছুঁয়ে জিভে ঠেকাল, মাথায় নিল, শেষে ছোট শিশুর মতো কোলে মাথা রেখে চোখ বুজল।

ওর খুব মৃদু শ্বাস পড়ছে। শরীরে আর কোন সাড়া নেই। কেমন অসহায়ের মতো রসিকের হাত জড়িয়ে শুয়ে আছে, যেন পরম শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। ওর চোখে মুখেও আর কোন বিকৃতি নেই। তার সবটুকু ঘিরে এক পরম প্রশান্তি নেমে এসেছে।

হঠাৎ নয়নের শরীরটা একটু কেঁপে উঠল তারপর চোখের কোল বেয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে নামল। রসিক ওকে ডাকতে গিয়ে দেখল, ওর শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, নিশ্বাস পড়ছে না।

রসিকের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল, আর ওর গাল বেয়ে টপ্ টপ্ করে জল গড়িয়ে নয়নের মুখে চোখে পড়তে লাগল। নয়নের হতভাগ্য জীবনটার কথা ভেবে রসিক কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারছিল না।

অনেকক্ষণ পর নয়নের মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে রসিক উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে ঘরে শিকল তুলে দিয়ে আশেপাশে ডাকাডাকি করে মানুষ জড়ো করল। কিন্তু নয়নের দেহ নিয়ে যেতে কেউ এগিয়ে এলো না, শেষে রসিক চারজনকে পাঁচ টাকা করে দিয়ে রাজী করাল।

দুটো বাঁশ দড়ি দিয়ে বেঁধে খাটিয়ার মতো করা হল কিন্তু কেউ নয়নের শরীর ছুঁতে রাজী হল না। রসিকই পাঁজা করে নয়নকে সেই খাটিয়াই শুইয়ে দিল। ওদের মধ্যে একজন একটা লণ্ঠন যোগাড় করে আনল আর একজন ক'টা বাঁশ কাঠ বেঁধে নিল। ওরা পাঁচজনে সেই অন্ধকার অন্ধকার পথে নয়নের দেহ তুলে হিজল মেহেদি বনের দিকে চলল। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই, মাঝে মাঝে সেই চারজনের মুখে বিড়ির আগুনটা জ্বলে জ্বলে উঠছিল।

কামরাঙা তলাটা খুঁজে পেতে কষ্ট হল না। জায়গাটা ওদের অনেকেরই চেনা, ওদের কেউ কেউ নয়নের খেলাঘরের সঙ্গী ছিল। আরো কিছু কাঠ কেটে এনে চিতা সাজানো হল।

রসিক খুব নিষ্ঠার সঙ্গে নয়নের মুখে আগুন দিল। দাউ দাউ করে চিতা জ্বলে উঠল। সারা বনটা হঠাৎ জেগে উঠল। পাখিদের ডাকে, ডানার শব্দে সেই শৈশবকালের হিজল মেহেদি জঙ্গল নয়নকে ঘিরে আর এক জগৎ তৈরি করল।

এপাশে ওরা চারজন বিড়ি টানছে, গল্প করছে। মাঝে মাঝে উঠে নয়নের শরীরটা উল্টে পাল্টে দিচ্ছে। বাঁশ দিয়ে চেপে হাতের পায়ের গাঁট পিটিয়ে ভেঙে দিচ্ছে, কখনো কাঠ গুঁজে দিচ্ছে।

রসিক কামরাঙা গাছটার গুঁড়িতে মাথা ঠেকিয়ে সেই লকলকে চিতার দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর মনের মধ্যে অনেক পুরনো কথা, পুরনো স্মৃতির তোলপাড় চলছিল। ওর বুকের মধ্যে একটা কান্না গুমরে গুমরে উঠছিল।

নিজেকে বড় একা, বড় অসহায় মনে হচ্ছিল তার। কোন্ শৈশবে মা মরেছে, বাপ মরল বেঘোরে। নয়নকে নিয়ে ও অনেক স্বপ্ন দেখেছিল। যখন মতি-ঠাকরুণের চিন্তায় ও পাগলের মতো পালিয়ে বেড়াচ্ছে তখন নয়ন ঝুমুরী আর এক জগতের খোঁজ এনে দিল, ওর বাঁচতে সাধ হল, ও নয়নকে নিয়ে ভবিষ্যতের চিত্র আঁকল। সেই নয়নও আজ তাকে ছেড়ে চলে গেল।

নয়ন নষ্টা, কুলটা, বেবুশ্যে—যারা মানুষকে ভালোবাসতে পারে, সোহাগ জানাতে পারে, তারা কি বেবুশ্যে হয়? রসিকের বারবার সেই রাত্তিরের কথা, সেই ছালা ঢাকা ক্লান্ত অসহায় নয়নের কথা মনে পড়ছিল। তার বুকের মধ্যে তাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে তার নিশ্চিন্তে ঘুমানোর ছবিটা চোখের সামনে ভাসছিল। সেদিন তার রোমশ বুকে নখ দিয়ে আঁচড় কাটতে কাটতে নয়ন ছোট্ট কিশোরীর মতো খুশিতে ছটফটিয়ে উঠেছিল।

বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া সবেদা, ফলসা, মাদার জঙ্গলের কথা, কাঠবিড়ালী, খট্টাস, সোনা সাপের কথা, হিজল মেহেদী বনে বউ বউ খেলার কথা বলতে বলতেও নয়ন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তার চোখে মুখে খুশি ফেটে পড়ছিল, নয়ন ঝুমুরীর শরীর থেকে সেদিন আর এক নয়ন বেরিয়ে এসেছিল—যার সবটুকু ঘিরে এক সরল নিষ্পাপ শিশুর আর্তি, যে রসিকের হাত ধরে আর এক রূপকথার রাজ্যে নিয়ে গিয়েছিল।

সেই মাদার, ভাঁট, মনিকাঁটার জঙ্গল, সেই পিপুল, বঁইচি, শিয়ালকাঁটার জঙ্গল, তার মাঝে নয়নের বড় সুখের কামরাঙা গাছ। তার আওতায় দুধলা ঘাসে শুয়ে নয়ন তার রূপকথার রাজ্যে উড়ে চলেছে—সেখানে কেউ আর তাকে খুঁজে পাবে না—কেউ তার শরীরটা নিয়ে আর ছিঁড়ে খুঁড়ে দেখবে না।

সেখানের খেলাঘরে এক মন মাতানো কেঁদুরের ধারে মনগড়া হিজল মেহেদি বনে সে আপন মনে বউ বউ খেলবে, ঘর সাজাবে, ঘর রাঙাবে, কেউ আর তাকে খুঁজে পাবে না।

ওদের ডাকে রসিকের তন্ময়তা কাটল, তাকিয়ে দেখল, চিতাটা পুড়ে পুড়ে মিইয়ে এসেছে। ওরা আগুন খুঁচিয়ে নয়নের নাইকুণ্ডুলীটা বের করে আনল।

রসিক উঠে নয়নের ভস্ম শেষটুকু কামরাঙা তলা খুঁড়ে ভালো করে পুঁতে দিল।

তার সব কাজ শেষ। রসিকের বুকটা হু হু করে কেঁদে উঠল, তার চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়তে লাগল, কামরাঙা তলা ভিজিয়ে দিল। রসিক আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না।

ওদের ডাকে রসিককে উঠতে হল। উঠতেই বুক পকেটে টুং টুং শব্দ বাজল, রসিক অনুভব করল, নয়ন তাকে ছেড়ে কোথাও যায় নি, তার বুকে শব্দের মতো লুকিয়ে আছে, একটু নাড়াচাড়া করলেই টুং টুং শব্দে বেজে উঠবে।

রসিক তার পকেট উজাড় করে মানুষ চারটিকে দিয়ে দিল। ওর আব কোন ভার রইল না। সে একলা বনপথ ধরে হাঁটতে লাগল। এই নির্জন একাকীত্বের মধ্যে পকেটের হাবছড়াটি টুং টুং শব্দ তুলে সঙ্গ দিচ্ছে। নয়নের অস্তিত্বটা তাব সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে।

টুং টুং শব্দে রসিক মাঝে মাঝে উন্মনা হয়ে পড়ছিল। তার ঘরেও একদিন এমনি টুং টুং মিষ্টি শব্দ উঠেছিল। হিলোড়া থেকে কেনা সেই চুড়ি ক'গাছা, বাস তেল আজও তার কুলুঙ্গিতে তোলা আছে। সেখানেও হয়তো তার জন্যে অমন মিষ্টি শব্দ, অমন মিষ্টি প্রতিধ্বনি লুকানো রয়েছে। নয়নের হারছড়া, বাতাসীর জন্যে কেনা চুড়ি ক'গাছা সব আজ তার মনে একই সুরে ঝংকার তুলছে, ওর বুকের সর্বত্র তারই প্রতিধ্বনি।

সেই নির্জন বনপথে হাঁটতে হাঁটতে, নয়নের চিন্তায় লালিত হয়ে, সে এক অন্তহীন শোক দুঃখ আর্তির আবর্তে বিষণ্ণ হয়ে পড়ছিল। তার বুকের মধ্যে

গোপন বক্তক্ষরণের মতো একটা লুকানো কান্নার ধারা বইছিল। একটা তীব্র হাহাকার তাকে ভীষণ উতলা করে তুলছিল।

ঐ রকম এক বিপন্ন আত্মমগ্নতার মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে, সেই নিরালা বনভূমিতে ফলসা, হিজল, মাদারের গন্ধে ভাসা প্রান্তরে হঠাৎ একটা পাখির বড় বিষাদ বিবহ সুর শুনতে পেল। কী মর্মান্তিক হৃদয়প্লাবি সেই ডাক। মন মানে না আর। লয়ন—লয়ন বউ—লয়ন।

অসহায়ের মতো বসিক ককিয়ে ওঠে, বুকটা মোচড দিয়ে ওঠে তার, হৃদয়ের সবটুকু একসাথে ডুকরে ওঠে। এই ব্যাকুলতার মধ্যেই সে শুনতে পায়, কে যেন বুকের মধ্যে লুকিয়ে বড বিষাদ নিয়ে বলছে, বড সাধ ছেল, উই হিজল মেহেদি বনে যিখানে কামবাঙা তলে তুধলা ঘাস জমেছে, উখানে মবতি, উই জাগায় আমায় পুডায়ো, বুল পুড়াবে তো ?

কখনো এক বিষাদময় সুরে বলছে, তুমি তো আমায় বিহার সুখ দিয়াছ, বিহাব কথায মন ভবেছে, কিন্তু লাগব, আমি তো জানি, উ হবার লয়, আমি যি লষ্টা, বেবুশ্যে। হাজাবো পাপে শবীল মুন ডুবছে, তুমায় মানতি পাবার মতু কুথাও কুনো পুণ্যি নাই তাই উ হওয়ার লয়, উ ই হতভাগীর সহি হবে না।

হাঁটতে হাঁটতে বসিকের বাব বার মনে পডছিল, তাব লয়ান বউ যেন সমানে বলে চলেছে, লাগর, ই হাবছডাটা তুমার বউকে দিও। উ পবলিই আমাব সুখ। লাগব, দিবে তো ?

———